তফসীরে নূরুল কোরআন

বিংশ পারা

২০

মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

বিংশ খণ্ড

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

বিশ পারা

২০

বিশতম খণ্ড

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
সম্পাদক- মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ,
সাবেক সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব গভর্ণস,
চেয়ারম্যান-তফসীরে তাবারী প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

تفسير نور القران

للعلامة محمد امين الاسلام

الجزء عشرون

পঞ্চম প্রকাশ ঃ	রজব-১৪৩৩ হিঃ জুন-২০১২ ইং আষাঢ়-১৪১৯ বাং
প্রকাশক ঃ	মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
স্বর্বস্বত্ব ঃ	গ্রন্থকারের
মুদ্রণে ঃ	নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস ফরাশগঞ্জ, ঢাকা
হাদীয়া ঃ	২৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা,
ফোন ঃ ৯৫৫৮৯১৩

Tafseer-e Nurul Quran (V) 20, by Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam, Published by Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207
Phone : 01713014889
Price 250.00 Tk., $ 10

بسم اللّٰهِ الرحمٰن الرَّحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে অগণিত শোকর যে তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের বিশতম খণ্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন, এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আদায় করি সেজদায়ে শোকরানা। আল্লাহ্ পাকের এ নেয়ামতের শোকর গুজারীর হক্ব আদায়ের সাধ্য আমাদের নেই, যদি সারা জীবন সর্বক্ষণ দরবারে এলাহীতে শোকর আদায় করতে থাকি, তবু এ মহান নেয়ামতের শোকর আদায় করে শেষ করতে পারবো না। শোকর গুজারীর এ অক্ষমতার জন্যে দরবারে এলাহীতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ পাক দয়া করে পবিত্র কোরআনের খেদমত করার তথা তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা এবং প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি হুকুমত এবং হেকমতের নবী, যিনি নবুওয়্যতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য, যিনি অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি মে'রাজের মহান মর্যাদায় সম্মানিত এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি এবং আসহাবের প্রতিও।

এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই পথিক-মুসাফির। আল্লাহ পাকই মানুষকে দান করেন এ জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব। জীবন-সফরের এদিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত করতে হবে, তার শিক্ষাও আল্লাহ পাকই আমাদেরকে দান করেছেন, আর এ উদ্দেশেই যুগে যুগে নবী রসূল গণ প্রেরিত হয়েছেন এবং নাজিল হয়েছে আসমানী গ্রন্থ সমূহ। যেভাবে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু নবী ও রসূল নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং সকল নবী রসূলগণের ইমাম ও দলপতি, ঠিক তেমনি তাঁর প্রতি যে আসমানী গ্রন্থ নাজিল হয়েছে তা-ও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ- পবিত্র কোরআন।

যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সর্বকালের সকল মানুষের জন্যেই তাঁর মহান আদর্শ, ঠিক তেমনি এ পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের পদচারণা হবে, সকলের হেদায়েতের জন্যেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, আর এজন্যেই পবিত্র কোরআন আজও সংরক্ষিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে, শুধু তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। আধুনিক বিশ্বের এ আনবিক যুগের এবং চন্দ্র বিজয়ী সভ্যতার এ যুগের সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান শুধু পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। বর্তমান সমস্যা জর্জরিত বিশ্বে সমস্যাগুলোর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমাধানের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা, এর একমাত্র কারণ হলো বিশ্ববাসী বিশ্ব-গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে এবং

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ থেকে বঞ্চিত।

খৃষ্টীয় ছয়শ' শতাব্দী মানব জাতির ইতিহাসের সর্বাধিক কলংকময় অধ্যায়। তখন মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল। কন্যা সন্তানকে তার পিতা-মাতাই জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করতো। জুলুম অত্যাচার ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, সারা পৃথিবী ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিশ্ব মানবের সেই চরম দুর্দিনে পবিত্র কোরআনই মানব জাতির অবস্থার পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। মানবতার চরম অভিশাপ পৌত্তলিকতা দূরীভূত হয়েছিল, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন রূপে, তিনি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে কঠোর সাধনা করেছিলেন। তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নেই মানব জাতির চরম দুর্দিন বিদায় নিয়েছিল। মানব সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছিল। সমগ্র বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যা দেখা যায়, বস্তু-কেন্দ্রিক সভ্যতার চরম উন্নতির এ যুগে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ পুনরায় আতংকিত, সর্বত্র সমরাস্ত্র তৈরীর কাজ বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার নামে বর্তমান বিশ্বে নগ্নতা, অশ্লীলতা, বর্বরতা এবং অরাজকতার যে প্রলয়ংকরী বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে, তার কারণে মানব সভ্যতা আজ পুনরায় টলটলায়মান। কিভাবে হবে দুর্গত মানবতার মুক্তি ও পরিত্রাণ? এ প্রশ্নের একই জবাব, আর তা হলো বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়নে এবং বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনেই বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বিশ্ব মানব যত শীঘ্র এ সত্য উপলব্ধি করবে তত শীঘ্র এ কল্যাণ সাধিত হবে। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করা পূর্ব শর্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাদের নিজ নিজ ভাষায় পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলেও বাংলা ভাষায় এর অভাব প্রকট। বাংলা ভাষী মানুষের কাছে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার তাগিদেই একদিন শুরু হয়েছিল তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আল্লাহ পাকের খাস রহমতে তা এক যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন্ ভাষায় শোকর আদায় করবো জানিনা যে, তিনি এ মহান গ্রন্থের বিশতম খণ্ড (বিশ পারা) পেশ করার তৌফিক দিয়েছেন।

হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা, হে আল্লাহ! এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা শুধু তোমার রহমতেই হয়েছে, আর যা কিছু হবে তা-ও তোমার রহমতেই হবে।

হে আল্লাহ! করুণা এবং কৃপার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার দেখ, তোমার পবিত্র কালামের আলো বিকীরণের তৌফিক দান কর এবং অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর বরকতে আমাদের দোয়া কবুল কর। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

সূচীপত্র

তফসীরুল কোরআন	২
তৌহীদের প্রমাণ	২
তফসীরুল কোরআন	৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৭
তফসীরুল কোরআন	১২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১২
কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী	১২
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা	১৩
দূরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য	১৪
তফসীরুল কোরআন	১৬
আল্লাহ্ পাকের দান অনন্ত অসীম	১৬
আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী	১৬
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর রেসালতের প্রমাণ	১৭
পবিত্র কোরআন হলো হেদায়েত ও রহমত	১৮
তফসীরুল কোরআন	২০
আয়াতের মর্মকথা	২১
হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত	২২
দাব্বাতুল আরদের কথা	২২
হাদীসের আলোকে	২৫
তফসীরুল কোরআন	২৮
কাফেররা কথা বলতে পারবেনা	২৮
তৌহীদের আরেকটি দলিল	২৮
কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা	৩০
তফসীরুল কোরআন	৩৭
নেক আমলের শুভ পরিণতি	৩৮
সূরা কাসাস প্রসঙ্গে	৪৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৪৪
তফসীরুল কোরআন	৪৫
তফসীরুল কোরআন	৫০

পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক	৫০
শিশু মুসা (আঃ) কখনও কাঁদতেন না	৫২
একটি বিস্ময়কর ঘটনা	৫৩
তফসীরুল কোরআন	৫৮
তফসীরুল কোরআন	৬৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৬৪
হযরত মুসা (আঃ)-এর যৌবনের একটি ঘটনা	৬৫
তফসীরুল কোরআন	৬৯
ইনশাআল্লাহ্ না বলার কারণে	৭১
তফসীরুল কোরআন	৭৩
ফেরেশতা হলো পথ-প্রদর্শক	৭৪
মর্মে কামেলের বৈশিষ্ট্য	৭৭
তফসীরুল কোরআন	৭৯
তিনজন বুদ্ধিমান	৮১
হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ক্রন্দণ	৮৪
হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির ইতিকথা	৮৪
তফসীরুল কোরআন	৮৪
মিসরের পথে হযরত মুসা (আঃ)	৮৪
হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত লাভ	৮৮
তফসীরুল কোরআন	৯০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৯০
ভয় দূর করার পন্থা	৯১
তফসীরুল কোরআন	৯৫
পূর্বরর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৯৫
ফেরাউনের ঔদ্ধত্য	৯৭
ফেরাউনের ইমারত ধ্বংস হলো	৯৯
তফসীরুল কোরআন	১০০
অহংকার পতনের কারণ হয়	১০১
হযরত মুসা (আঃ) সমীপে ইবলিস	১০২

প্রিয়নবী (দঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ	১০৭
আয়াতের মর্মকথা	১০৯
তফসীরুল কোরআন	১১২
তফসীরুল কোরআন	১১৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১১৬
পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মর্মস্পর্শী এবং জীবন্ত	১১৭
শানে নজুল	১১৮
আহলে কেতাব মোমেনদের জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব	১২০
তফসীরুল কোরআন	১২৪
শানে নজুল	১২৪
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	১২৬
কাফেরদের সন্দেহের প্রথম জবাব	১২৮
দ্বিতীয় জবাব	১২৯
তফসীরুল কোরআন	১৩১
দুনিয়ার জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী	১৩২
শানে নজুল	১৩৩
তফসীরুল কোরআন	১৩৮
সাফল্য কোন্ পথে?	১৩৯
তৌহীদের ঘোষণা	১৪০
তফসীরুল কোরআন	১৪১
ইসলামে জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব	১৪৬
তফসীরুল কোরআন	১৪৯
কারুণের পরিচিতি	১৫১
অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি	১৫৩
কারুণের সম্পদের বিবরণ	১৫৪
তফসীরুল কোরআন	১৫৮
তফসীরুল কোরআন	১৬৩
হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কারুণের ষড়যন্ত্র	১৬৩
কারুণের ভয়াবহ পরিণতি	১৬৪
নবী (আঃ)-এর শানে বেআদবীর পরিণতি	১৬৮

যাঁদের জন্যে জান্নাত	১৬৯
শুভ পরিণতি পরহেযগারদের জন্যে	১৭০
আয়াতের মর্মকথা	১৭০
তফসীরুল কোরআন	১৭২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৭২
সূরা আনকাবুত প্রসঙ্গে	১৭৯
পূর্ববতী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৭৯
তফসীরুল কোরআন	১৮০
শানে নজুল	১৮০
কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী	১৮৫
মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ	১৮৬
শানে নজুল	১৮৯
তফসীরুল কোরআন	১৯৩
তফসীরুল কোরআন	১৯৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৯৮
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	১৯৮
তফসীরুল কোরআন	২০১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২০১
তফসীরুল কোরআন	২০৫
কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী	২০৭
আয়াতের মর্মকথা	২০৭
আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম	২০৭
তফসীরুল কোরআন	২১০
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরত	২১১
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ নেয়ামত	২১৩
তফসীরুল কোরআন	২১৫
তফসীরুল কোরআন	২২০
তফসীরুল কোরআন	২২৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২২৩
তফসীরুল কোরআন	২২৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২২৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

বিশতম খন্ড বিশ পারা

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ
السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ
لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৬০) বরং (তিনিই উত্তম) যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন। এরপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করি, তাতে তরুলতা জন্মাতে পার এমন সাধ্য তো তোমাদের ছিল না। তবুও কি বলবে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য রয়েছে? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

(৬১) (জিজ্ঞাসা করি) পৃথিবীকে অবস্থানের উপযোগী করেছেন কে? কে এর ফাঁকে ফাঁকে নদ-নদী তৈরী করেছেন? এবং কে তাতে সংস্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দু' দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(৬২) (জিজ্ঞাসা করি) কে আছে যে বিপন্ন অসহায় (মানুষ) যখন তাঁকে ডাকে তখন তার বিপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্য উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

তফসীরুল কোরআন

পূববর্তী আয়াত সমূহে কাফের-মুশরেকদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের তৌহীদে বিশ্বাস করতো না, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে স্বীকার করতো না। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, হয়তো এ হতভাগারা শেরক ও কুফর থেকে বিরত হবে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কারণে যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের অবস্থা দেখে নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। কেননা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁরই সষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো শেরক ও কুফর থেকে খাঁটি তওবা করা এবং এক আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া।

পূববর্তী পারার সর্বশেষ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

آَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকই উত্তম? নাকি তারা যাদের শরীক করে সেই অসহায় জড় পদার্থ মূর্তিগুলো উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি সব কিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টি জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

তৌহীদের প্রমাণ

বল দেখি, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন?

وَاَنْزَلَ لَكُمْ

আর কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান? আর ঐ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকই জমিনে তরুলতা উৎপাদন করেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নেই, বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত-অসীম কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

(সূরা আল এমরান)

"নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিজীবি মহলের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ (সূরা যারিয়াত)

"এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (সূরা যারিয়াত)

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছ না"?

বস্তুতঃ মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং বার্ধক্যের বিভিন্ন অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ পাক জমীনকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তাতে উদ্যান তৈরী করে দেন। এ পৃথিবীতে সামান্য তরুলতা উৎপাদনের ক্ষমতা কি তোমাদের আছে?

বস্তুতঃ এসব কিছুই ধ্রুব সত্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যের পূজা করতে যাও কোন্ যুক্তিতে? কোন্ বুদ্ধিতে?

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

তবুও কি বলবে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য প্রভু রয়েছে? বরং তারা এমন লোক যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে। অক্ষম অসহায় জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করা, এমনকি আল্লাহ পাকের সমান এবং সমকক্ষ মনে করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا

লক্ষ্য করে দেখ, এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করেছে কে? আল্লাহ পাকই পৃথিবীকে মানুষের অবস্থান এবং বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়েছেন, তদুপরি তার ফাঁকে ফাঁকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবী যেন নড়াচড়া না করে, তজ্জন্যে পাহাড়গুলোকে পৃথিবীর উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন, যাতে করে একের পরিচয় অন্যের মাঝে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকাছি থেকেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র এবং পরিচয় অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এসব একমাত্র আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতেরই জীবন্ত নিদর্শন।

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

"তবুও কি বলবে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কোন প্রতিপালক রয়েছে"?

جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا

অর্থাৎ জমীনের কিছু অংশকে আল্লাহ্ পাক উঁচু করে দিয়েছেন এবং তাকে মানুষের বাসোপযোগী করে দিয়েছেন।

وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا

অর্থাৎ জমীনের মধ্য দিয়েই নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন।

وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ

জমীন যেন স্থির থাকে সেজন্য পাহাড়গুলোকে পেরেকের ন্যায় বসিয়ে দিয়েছেন।

الْبَحْرَيْنِ

দু' প্রকার সমুদ্র, অর্থাৎ একটির পানি মিষ্ট, আরেকটির পানি লবনাক্ত, আর এ দু' নদীর মিষ্ট ও লবনাক্ত পানি যেন একাকার না হয়ে যায়, তাই উভয় নদীর মধ্যে আল্লাহ্ পাক একটি আড়াল সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু আল্লাহ্ পাকই করেছেন। এতদসত্ত্বেও একথা কি বলতে পার-

اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সাথে কি অন্য উপাস্য থাকতে পারে? অবশ্যই নয়।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানেনা যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেউ নয়। এজন্যে তৌহীদের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা এসব বিষয় চিন্তা করেনা, তারা শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়, আর কিছু লোক এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও জেদের বশীভূত হয়ে শেরক বর্জন করেনা।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ

"জিজ্ঞাসা করি কে আছে যে বিপন্ন, অসহায় লোক, যখন তাঁকে ডাকে তখন তার কাছে ছুটে আসে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেয়, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন, এখনও কি বলবে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে অন্য মা'বুদ রয়েছে? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের মহিমা অপার, তাঁর দয়া মায়া অন্তত অসীম, তিনিই মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেন। বিপদগ্রস্ত, অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ তিনিই শ্রবণ করেন, এমনকি এমনও সময় আসে, যখন কাফের-মুশরেকরা সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে এক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে থাকে। দুনিয়াতে ইতিপূর্বে যারা ছিল,

তাদের স্থলে তিনিই নতুনদেরকে বসবাস করার অনুমতি দান করেন, তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন, আল্লাহ্ পাকের অযাচিত দয়া-মায়ায় মানুষ হয় লালিত-পালিত, লাভ করে সে দৈনন্দিন জীবনের সকল উপকরণ। যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী, আহার, বাসস্থান এক কথায় মানব জীবনের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের দান হিসেবেই মানুষ লাভ করে। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

(তবুও কি বলবে, আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে অন্য কোন মাবুদ রয়েছে?)

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

(আসল কথা হলো, তারা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে।)

লক্ষ্যণীয়, ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক তৌহীদের প্রমাণ স্বরূপ আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন, আর এ আয়াতে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। মানুষ যখন অসহায় হয়ে ফরিয়াদ করে, তখন কে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করে?

দ্বিতীয়তঃ সুখের সময় মানুষ অনেককেই কাছে পায়, কিন্তু বিপদের মুহূর্তে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ থাকেনা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের অনুভূতি রয়েছে, যে কারণে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে শুধু আল্লাহ্ পাককেই ডাকে। অতএব, আল্লাহ্ পাকই সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি মানুষের চরম বিপদের মুহূর্তে মানুষকে রক্ষা করেন এবং মানুষ যখন চরম অসহায় হয় তখন শুধু এক আল্লাহ্ পাকের নিকটই ফরিয়াদ করে। আর তিনিই মানুষকে বিপদমুক্ত করেন।

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেন"।

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের বিদায়ের পর তোমাদের তিনি পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেন, পৃথিবীতে বাস করার এবং এখানে কাজ করার ও প্রভাব বিস্তার করার তওফিক দান করেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এর অন্য একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে জ্বীনদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এজন্যে একথা বলা হয়েছে যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি মনোনীত করবো"।

إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

"তবুও কি বলবে, আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কোন উপাস্য রয়েছে"?

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

"তোমরা অতি অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের ও একত্ববাদের সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনে না।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾
قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৩) (বল) মাঠে ময়দানে এবং সমুদ্রের অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথ দেখায়? কে তাঁর রহমতের পূর্বে সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন? আল্লাহ্ পাকের সাথে আর কোন মা'বুদ আছে কি? তারা যাদেরকে শরীক করতে চায় আল্লাহ্ পাকের শান তা থেকে বহু উর্দ্ধে।

(৬৪) বরং তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন সব কিছু, পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আসমান জমীন থেকে রিয্‌ক দান করে থাকেন, আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে আর কোন উপাস্য আছে কি? (হে রসূল! আপনি) বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

(৬৫) (হে রসূল! আপনি) বলুন, আসমান জমীনে যে কেউ রয়েছে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত গোপন বিষয়ের খবর কেউ রাখে না, তারা কখন পুনঃরুত্থিত হবে তাও জানেনা।

(৬৬) বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, বরং তাতে তারা সন্দেহে রয়েছে, বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল স্বরূপ তাঁর কুদরত হেকমতের কয়েকটি নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত সমূহেও আল্লাহ পাকের কুদরতের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

"(বল) মাঠে-ময়দানে এবং সমুদ্রের অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথ দেখায়? কে তার রহমতের পূর্বে সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন"।

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক ভাগে বা স্থল ভাগে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যখন কোন দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না তখন কে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হলো আল্লাহ পাকই পথ দেখিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বৃষ্টির জন্যে যখন মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে তখন আল্লাহ পাকই সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।

اَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

যিনি মানুষকে এত নেয়ামত দান করেন এবং এমন নেয়ামত দান করেন যা কেউ দিতে পারেনা, এমন অবস্থায়ও কি বলবে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ আছে? কখনও নয়, যাঁর কুদরত অনন্ত অসীম, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত বিশ্ব জগতই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তাঁরই একচ্ছত্র ক্ষমতা, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, হতে পারে না।

تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"তারা যাদেরকে শরীক করতে চায় আল্লাহ পাকের শান তা থেকে বহু উর্দ্ধে"।

তাদের শেরক থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র।

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

"বরং তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন সব কিছু এবং পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করবেন"।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করবেন। যে কেয়ামতের দিনের কথা তারা অস্বীকার করে সেদিন তাদেরকে পুনরায় হাযির করা হবে, কেননা যিনি সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

"আর কে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিয্‌ক প্রদান করেন"?

এ প্রশ্নের জবাবও একই, এক আল্লাহ্ পাকই রিয্‌কদাতা, তিনিই রিয্‌কের মালিক। আসমান জমীনের গোপন সম্পদের অধিকারী তিনি, আর আকাশ-পাতালের সব কিছু রয়েছে তাঁর নখদর্পণে, তিনিই রিয্‌কদাতা, তিনিই পালনকর্তা। অতএব তোমরাই বল-

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

"আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ আছে কি"?

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকই মানুষকে তার অস্তিত্ব তথা জীবন দান করেছেন। তাই জীবন রক্ষার্থে জীবিকাও তিনিই দান করেছেন এবং জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজনও তিনিই করেছেন। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (সূরা বাকারা)

"আর তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا (সূরা হুদ)

"আর প্রাণী মাত্রেরই রিয্‌কের দায়িত্ব এক আল্লাহ্ পাকের উপর"।

আল্লাহ্ পাকই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং জমীন থেকে মানুষের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেন। এতদসত্ত্বেও এমন করুণাময় আল্লাহ্ পাকের সাথে তোমরা শেরক করবে?

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"(হে রসূল! আপনি) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ আছে বলে যদি তোমরা মনে কর তবে তার দলিল পেশ কর। শেরক সঠিক হওয়ার পক্ষে যদি তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ থাকে তবে তা পেশ কর।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"(হে রসূল! আপনি) বলুন, আসমান জমিনে যে কেউ রয়েছে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত গোপন বিষয়ের খবর কেউ রাখেনা, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে তাও জানেনা"।

যেভাবে আসমান জমীনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা এবং পৃথিবীতে অগণিত গোপন বস্তু রয়েছে, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতকেও তোমাদের

নিকট থেকে গোপন রাখা হয়েছে, কোন মানুষ এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, কবর থেকে মৃতদেরকে কখন পুনরুত্থান করানো হবে তা যেমন কেউ জানেনা, তেমনি কেয়ামত কবে হবে তাও কেউ জানেনা।

مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ।

যারা জমীনে বাস করে তথা জ্বীন ও মানুষ তাদের কেউই গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়। এক আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এ সম্পর্কে অবগত নয়।

وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

আর তারা একথাও জানেনা যে কখন হবে তাদের হাশর অর্থাৎ কখন কেয়ামত হবে এবং কখন মানুষের পুনরুত্থান হবে, তাও তারা জানেনা।

এলমে গায়ব

মূলতঃ গায়বী খবর তথা অদৃশ্য জগতের কথা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত কেউ এ সম্পর্কে অবগত হতে পারেনা, একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান বা এলমে গায়ব। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ

"আর আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে গায়বী জ্ঞানের কুঞ্জিকা"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা, পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে কেয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান, তিনি ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনিই সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। মানুষ তো জানেনা যে কেয়ামত কবে হবে? আসমান জমীনে এমন কেউ নেই যে এ সম্পর্কে অবগত রয়েছে। গায়বী এলম আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যারা এসব কথা বলে যে অমুক নক্ষত্রের সময় ভ্রমণ করলে এমন হবে, অমুক সময় বিবাহ হলে এমন হবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এটি আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে গায়বের এলম শুধু তাঁরই নিকট রয়েছে। বন্দা তো এ খবরও রাখেনা যে তার মৃত্যু কবে হবে? আর কখন হবে কেয়ামত?

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

"বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে"।

যেহেতু কাফেররা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের প্রতিই বিশ্বাস করেনা, তাই আখেরাত সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ।

পক্ষান্তরে, যেহেতু মোমেনগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান রাখে, সেজন্যে তারা কেয়ামতের প্রতিও বিশ্বাস রাখে। কিন্তু কেয়ামত কবে হবে, এ সম্পর্কে তারাও জানেনা। গায়বী এলম যদি দয়া করে আল্লাহ্ পাক কাউকে দান করেন, তবে তা আল্লাহ্ পাকের দানই হয়, এর অতিরিক্ত কিছু নয়। গায়ব তিনি জানেন একথা কখনও বলা হবে না, আলিমুল গায়ব বা গায়বী বিষয়ের জ্ঞানী একমাত্র আল্লাহ্ পাকই, আর কেউ নন।

بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا

বরং তারা তাতে সন্দেহে রয়েছে, অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে কেয়ামত সম্পর্কে যে খবর দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তারা সন্দিহান রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بل শব্দটি لو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে যে এলম তারা আখেরাতে অর্জন করবে, তা যদি দুনিয়াতেই অর্জিত হতো, তবে তারা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করতো না। কিন্তু এখন কেয়ামত সম্পর্কে তাদের একীন নেই, তাই তারা সন্দেহে পড়ে আছে।

بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তি যেমন তার সম্মুখে কোন কিছুই দেখেনা, ঠিক তেমনি কাফেররাও তাদের ভবিষ্যতের কিছুই দেখেনা।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে তিনি ব্যতীত গায়বের এলম কারোরই নেই, বরং এরপর এরশাদ করেছেনঃ এ কাফেরদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন উপলব্ধি নেই। এরপর এরশাদ করেছেন যে কেয়ামতের দলিল-প্রমাণ দেখে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে কেয়ামত অবশেষ হবে, কিন্তু কবে হবে তা কেউ জানেনা। এরপর এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের দলিল-প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে, আর এ সন্দেহের নিরসন তারা করতে পারেনা। এরপর এরশাদ করেছেন, এ কাফেররা অন্ধ হয়ে রয়েছে। এ অবস্থা হলো মুশরেকদের।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাজেদী (রঃ) লিখেছেন, যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের তিনটি দল রয়েছে, একদল যাদের প্রকাশ্যে আখেরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং এ অবস্থায়ই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৬৮-৬৯

"বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে"।

আর কাফেরদের দ্বিতীয় দল যারা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا

বরং তারা তাতে সন্দেহে রয়েছে, আর কাফেরদের তৃতীয় দল পথভ্রষ্টতায় আরো উন্নতি করেছে অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ

"বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে"।[১]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ءَإِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا
لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن
قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا۟
فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ
عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৬৭) কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদের পুনরুত্থান করা হবে?

(৬৮) ইতিপূর্বেও আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বস্তুতঃ এসব প্রাচীনদের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৬৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে তা লক্ষ্য করে দেখ।

(৭০) (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না আর তাদের ষড়যন্ত্রে মনক্ষুন্ন হবেন না।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৭৭৪

(৭১) আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল কখন এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

(৭২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো, সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে, তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করতো। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

"আর কাফেররা বলে, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদের পুনরুত্থান করা হবে"?

তাদের এসব কথা তাদের অন্তরের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

لَقَدْ وُعِدْنَا

অর্থাৎ তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখেরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। অতএব, আখেরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় উক্তির জবাবেই তাদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহ জাতি উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি। আখেরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুম্বি ইমারত গুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে

পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

"তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ এবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই এবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআন যখন নাজিল করা হয়, তখন যেভাবে কাফেররা আখেরাতকে অবিশ্বাস করতো, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সব কিছু মনে করে, আর আখেরাতকে শুধু ভুলে যায় না, বরং অবিশ্বাস করে। তাদের উদ্দেশেও পবিত্র কোরআনের একই নির্দেশঃ পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুসোলিনী এবং (সাবেক) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন যে মহা সত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের কাফেরদের উদ্দেশে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী রসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতিপূর্বে যে সব জাতি কোন নবী রসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আযাবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।[১]

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, আর তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মনক্ষুন্ন হবেন না"।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

বর্ণিত আছে, মক্কার কোন কোন কাফের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শুধু যে অস্বীকার করতো তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্রুপও করতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, (হে রসূল!) কাফেরদের এ অন্যায় আচরণে আপনি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৬৮-৬০

দুঃখিত হবেন না, যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন যে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে তবে তাদের জন্যে করার কিছুই নেই।

দ্বিতীয়তঃ তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রুপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত। তারা তাদের এ অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

দূরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সে স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যায়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সে প্রতিশ্রুত কেয়ামত কবে আসবে"?

এটা নিঃসন্দেহে দূরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য, ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হবার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উন্নতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলী ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান, তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

"(হে রসূল, আপনি) ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো, বিচিত্র নয় যে তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে"।

অর্থাৎ তোমরা যে আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চাও তা অতি সত্বরই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সে আযাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের ৭০ জন নিহত হয়েছে এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছে, আর আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখ্য, কখনও অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শাস্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়, বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই

তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রকে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আযাবকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আযাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শাস্তি, যে যুদ্ধে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

তরজমা

(৭৩) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন কিন্তু তাদের অনেকেই শোকর গুজার হয় না।

(৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

(৭৫) নিশ্চয় আসমান জমীনে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

(৭৬) বণী ইসরাঈলরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করে পবিত্র কোরআন তার অনেক কিছুই বর্ণনা করে থাকে।

(৭৭) এবং নিশ্চয় কোরআন মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত।

(৭৮) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে

দেবেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি মহাজ্ঞানী।

(৭৯) অতএব (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ্ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন, নিশ্চয় আপনি সুস্পষ্ট সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ্ পাকের দান অনন্ত অসীম

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। মানুষ তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করে থাকে, কিন্তু তবুও তারা মহান দাতার প্রতি শোকর গুজার হয় না। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক এমন করুণাময় যে তিনি ইচ্ছা করলে মোমেনদের মাফ করে দেন, আর কাফেরদের আযাবকে বিলম্বিত করেন যাতে তারা আত্ম-সংশোধনের সুযোগ লাভ করে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

"অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না"-এর অর্থ হলো অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের হক্ব আদায় করে না তথা তাঁর নেয়ামতের কদর করেনা। আর এ কারণেই তারা আযাবকে ত্বরান্বিত করার কথা বলে।

আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের মহাজ্ঞানী হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। মানুষ যা তার মনের গহনে গোপন রাখে আর যা কিছু প্রকাশ করে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এর তাৎপর্য এই যে, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের অন্তরে যে শত্রুতা পোষণ করতো অথবা যা প্রকাশ করতো সবই আল্লাহ্ পাক জানেন, তিনি অবশ্যই এজন্যে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। আর শাস্তির ব্যাপারে যে বিলম্ব হয় এর কারণ এই নয় যে কোন বিষয় আল্লাহ্ পাকের নিকট গোপন রয়েছে, বরং সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান।

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর আসমান জমীনে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাব তথা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত নেই।

অতএব, কাফেরদের অন্যায়-অনাচার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তাদের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। সব কিছুই লওহে মাহফুজে নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তা যথা সময়েই তাদের প্রতি আপতিত হবে।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"বনী ইসরাঈলরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, পবিত্র কোরআন তার অনেক কিছুই বর্ণনা করে থাকে"।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর রেসালতের প্রমাণ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনার পর এ আয়াত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর রেসালতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল হলো পবিত্র কোরআন যা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল হয়েছে।

পবিত্র কোরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। সমস্ত আসমানী কিতাবে যা কিছু রয়েছে, তা সবই স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং তার চেয়ে বাড়তি অনেক কিছুই রয়েছে, দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। ইহুদী এবং নাসারাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, সেগুলোর চূড়ান্ত মীমাংসাও করে দিয়েছে পবিত্র কোরআন। ইহুদী-নাসারাদের যে সব বিষয়ে সন্দেহ ছিল, সে সব সন্দেহ দূর করে দিয়েছে পবিত্র কোরআন। সরিয়ে দিয়েছে সকল অজানার অবগুণ্ঠন। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী-নাসারারা যুগ যুগ ধরে যে মতভেদ প্রকাশ করে এসেছে, তারও চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে পবিত্র কোরআন। তিনি ছিলেন আল্লাহর বন্দা এবং সত্য রসূল। নাসারারা তাঁর সম্পর্কে যে অতিশয়োক্তি করে যে তিনি আল্লাহর পুত্র-তা সম্পূর্ণ মিথ্যা (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

এমনিভাবে, ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে যে বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করে, তা-ও পুরোপুরি মিথ্যা। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। এমনিভাবে, হযরত মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী-নাসারাদের মধ্যে যে মতভেদ ছিলো তারও চূড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি যাদুকরীর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে, তা-ও পবিত্র কোরআন দূরীভূত করে দিয়েছে।

যাহোক, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ এবং আখেরাতের সুনিশ্চিত হবার কথা ঘোষণার পর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ

অর্থাৎ এই মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন যা খাতেমুন নবিয়্যীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল হয়েছে, তার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বণী ইসরাঈল যে সব ব্যাপারে মতভেদ করতো, পবিত্র কোরআন সে সব বিষয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছে।

মূলতঃ বণী ইসরাঈলে অনেক ফেরকা ছিল, প্রত্যেক ফেরকার ধর্ম বিশ্বাস ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, তওহীদ এবং ত্রিত্ববাদ, হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ওজায়ের (আঃ), জান্নাত এবং দোযখ-এক কথায় এমনি অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে নান ফেরকা ছিলো। পবিত্র কোরআন এর প্রত্যেকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় সত্যকে ঘোষণা করেছে। এটি পবিত্র কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর এটিই প্রিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১]

এখানে উল্লেখ্য, তখনকার দিনে ধর্মীয় বিষয়ে বণী ইসরাঈলীদেরকে সর্বাধিক অভিজ্ঞ মনে করা হতো। কেননা দু' হাজার বছরে তাদের মধ্যে চার হাজার নবীর আগমন হয়েছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও বণী ইসরাঈলের মধ্যে আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, চিন্তাধারা ও কর্মসূচীতে মতভেদ ছিল প্রকট। তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আছন্ন হয়ে পড়েছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে তথা পবিত্র কোরআনের অবতরণের মাধ্যমে তাদের গোমরাহীর অন্ধকার দূর করা হলো। কেননা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, পবিত্র কোরআন হলো বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ পাকের শেষ বাণী, মানব জাতির মুক্তির মহা সনদ এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী মুক্তির পাথেয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

পবিত্র কোরআন হলো হেদায়েত ও রহমত

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"আর নিশ্চয় পবিত্র কোরআন হলো মোমেনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত"।

কেননা পবিত্র কোরআন দ্বারা মোমেনগণই উপকৃত হয়ে থাকে। আর পবিত্র কোরআনের বরকতেই মোমেনগণ আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করে থাকে। পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভ করা যায়।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন যা ঘোষণা করার তা করে দিয়েছে। আল্লাহ পাক শেষ বিচারের দিনে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। একথার তাৎপর্য হলো, বণী

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৭

ইসরাঈলের মধ্যেকার বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে পবিত্র কোরআন যে ঘোষণা দিয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তা কার্যকর করে দেবেন।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

"আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

তাঁর ফয়সালা কেউ রদ করতে পারেনা। তাঁর সিদ্ধান্ত কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা, আর তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

অতএব, (হে রসূল!) আপনি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, দূরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, কারো দুশমনীর পরোয়া করবেন না।

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

নিশ্চয় আপনি সুস্পষ্ট ও সঠিক পথে রয়েছেন। আপনার পথ ধ্রুব সত্য, আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, আপনি সরল সঠিক পথের দিশারী। অতএব, এক আল্লাহ্ পাকের প্রতিই আপনি ভরসা রাখুন, আর যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখে, তার জন্যে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য যথেষ্ট।[১]

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারারা যে অন্যায় মন্তব্য করেছে, পবিত্র কোরআন তার বাতুলতা ঘোষণা করে বলেছে, তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল, এর কমও নয়, বেশীও নয়। তিনি আল্লাহর হুকুমে এবং কুদরতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাননীয়া মাতার পবিত্রতা সন্দেহাতীত। তাঁর মাহাত্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, পবিত্র কোরআন মোমেনদের জন্যে শুধু হেদায়েতই নয়, রহমতও, অতএব (হে রসূল!) আপনি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, দুশমনের দুশমনীর প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। আপনি সত্যের উপর রয়েছেন, অতএব কারো পরোয়া করার আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭২

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَ
إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَ
يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ
بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ
بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

তরজমা

(৮০) (হে রসূল!) মৃতকে আপনি কথা শোনাতে পারবেন না, বধিরকেও ডাক শোনাতে পারবেন না, বিশেষতঃ যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

(৮১) আর (হে রসূল!) অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহী থেকে পথে আনতে পারবেন না, আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে, ফলতঃ তারাই মুসলমান থাকে।

(৮২) আর যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি মাটির গর্ভ থেকে বের করব এমন এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে এজন্যে যে লোকেরা আমার নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাসী ছিল।

(৮৩) আর স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকটি দলকে, যারা আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করতো এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

(৮৪) অবশেষে যখন তারা সকলেই উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বলবেন, "তোমরা কি আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অথচ সে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞানার্জনও করোনি, না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে"?

তফসীরুল কোরআন

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে সর্বদা উদগ্রীব থাকতেন। আর তাদের হেদায়েত গ্রহণ না করার কারণে তিনি অত্যন্ত

ব্যথিত হতেন। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى

(হে রসূল!) আপনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যত আগ্রহীই থাকুন না কেন, তাদেরকে আপনি সত্যের বাণী শোনাতে পারবেন না, কেননা তাদের অন্তর মৃত, আর মৃত ব্যক্তিকে কেউ কথা শোনাতে পারেনা।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সয়ুতি (রঃ) তফসীরকার ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফেরদেরকে মৃতদের ন্যায় বলেছেন, মৃত লোকেরা যেমন কারো কথা শুনতে পারেনা, ঠিক তেমনি কাফেররাও আল্লাহর রসূলের কথা শুনতে পায়না, আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেনা, তাই আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, (হে রসূল!) আপনি মৃতদেরকে কথা শোনাতে পারবেন না, এটি আপনার শক্তির বাইরে।[১]

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

আর যদি ধরে নেয়া যায় যে তারা মৃত নয়, তবে বধির তো অবশ্যই। আর (হে রসূল!) আপনি বধিরদেরকে ডাক শোনাতে পারবেন না, বিশেষতঃ যখন তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, যারা বধির তারা তো কোন কিছু শ্রবণ করতেই পারেনা, এমন অবস্থায় "পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যায়" কথাটির প্রয়োজন কোথায়?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, এ বাক্যটি কথাটির উপর জোর দেয়ার জন্যে সংযোজিত হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বধির ব্যক্তি যদি মুখোমুখি থাকে, তবে চিৎকার দিয়ে কথা বললে কিছুটা বুঝতে পারে। আর কখনো ইঙ্গিতেও কিছুটা আঁচ করতে পারে। কিন্তু যদি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যায়, তবে কিছুই সে শ্রবণ করতে পারেনা এবং বুঝতেও পারেনা।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হলো, কাফেররা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করতে রাজী নয়। তাই তাদেরকে সত্য বাণী শ্রবণ করানো সম্ভব নয়। কেননা যখন তারা বধির হওয়ার কারণে নিজে শ্রবণ করতে পারেনা এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যাওয়ার কারণে ইশারা-ইঙ্গিতও দেখেনা, এমন অবস্থায় কি করে তারা সত্য উপলব্ধি করবে? আর যদি ধরে নেয়া যায় তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেনি, তবু তাদেরকে সত্য বাণী পৌঁছানো সম্ভব নয়, কেননা তারা অন্ধ।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ

১। আদ্‌দুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৫

আর (হে রসূল!) আপনি অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহী থেকে পথে আনতে পারবেন না। কেননা কুফরী ও নাফরমানীর কারণে মানুষ মনের দিক থেকে অন্ধ হয়ে যায়, তাদের অন্তর-দৃষ্টি লোপ পায়, আর ঈমানের কারণে অন্তর-দৃষ্টি শক্তিশালী হয়। কাফেররা মনের দিক থেকে অন্ধ হয়ে পড়েছে, তাই (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সত্য কথা শোনাতে পারবেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক যার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, সে ঈমানের পথ দেখতে পায় না, তাই (হে রসূল!) আপনি এ কাফেরদেরকে সত্য বাণী শ্রবণ করাতে পারবেন না।

হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত

(হে রসূল!) আপনার প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে চিরন্তন সত্য, কিন্তু তা গ্রহণের জন্যে কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে। যেমন জীবিত হওয়া, মৃত না হওয়া, চক্ষুষ্মান থাকা, অন্ধ না হওয়া, বধির না হওয়া।

এতে কোন সন্দেহ নেই, ঈমান আনয়নের কারণে মানুষের মন নব জীবন লাভ করে, তার অন্তর-দৃষ্টি উন্মীলিত হয়।[১]

اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

"আর যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি মাটির গর্ভ থেকে বের করবো এমন এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্যে যে লোকেরা আমার নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাসী ছিল"।

দাব্বাতুল আরদের কথা

বর্ণিত আছে যে কেয়ামতের নিকট-পূর্বে মক্কার সাফা পর্বতটি বিদীর্ণ হবে, সেখান থেকে একটি বিস্ময়কর জন্তু বের হবে, সে মানুষের সাথে কথা বলবে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে এ জীবটি এমন হবে না যে তার লেজ থাকবে বরং তার দাড়ী থাকবে, এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে সে মানুষ হবে, চতুঃস্পদ জন্তু নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকারের মত হলো, এটি চতুঃস্পদ জন্তু হবে।

আবদ এবনে হুমায়েদ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঐ জীবটি বিভিন্ন বর্ণের পাখা বিশিষ্ট হবে। তার চারটি পা থাকবে। সে হাযীদের পেছনে বের হবে।

এবনে জোরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আবুল জোবায়ের (রঃ) 'দাব্বাতুল আরদ' এর অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে তার মাথা হবে গরুর মাথার ন্যায়। তার চক্ষুগুলো হবে শুকরের চক্ষুর ন্যায়। আর তার কান হবে হাতির কানের ন্যায়। তার বক্ষ হবে বাঘের বক্ষের ন্যায়। আর তার বর্ণ হবে চিতা বাঘের ন্যায়, তার পাঁজর হবে বিড়ালের পাঁজরের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৭

ন্যায়। তার পা হবে উষ্ট্রের পায়ের ন্যায়। তার নিকট মুসা (আঃ)-এর লাঠি থাকবে, সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি থাকবে, প্রত্যেক মোমেনের কপালে লাঠি দ্বারা চিহ্ন দেবে, ফলে তার চেহারা জ্যোতির্ময় হবে, আর কাফেরের চেহারায় হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি দ্বারা চিহ্ন দেবে, পরিণামে তার চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করবে। কপালে প্রদত্ত এ চিহ্নটি এত সুস্পষ্ট হবে যে, লোকেরা যখন বাজারে কেনা-কাটার জন্যে যাবে, তখন কাফের ও মোমেনের পরিচয় পাওয়া যাবে, আর লোকেরা এভাবে বলবে, হে কাফের! এ বস্তুটির মূল্য কত। হে মোমেন! এ জিনিসটির দাম কত। এরপর 'দাব্বাতুল আরদ' নামক এই জীবটি মানুষকে বলবে হে অমুক! তুমি জান্নাতী, হে অমুক! তুমি দোযখী। আলোচ্য আয়াত

إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

এর এটিই হলো অর্থ।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক জীবটি সাফা নামক পর্বতের ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) একথাও বলেছেন যে, এ জীবটি এত উঁচু হবে যে তার মাথা মেঘের স্তরকে স্পর্শ করবে, আর তার পাগুলো জমীনের অভ্যন্তরে থাকবে। সে নামাজ আদায়রত কোন লোকের পার্শ্ব অতিক্রম করার সময় তাকে বলবে, তোমার নামাজের কি প্রয়োজন, এরপর তার মাথায় বা নাকের উপর চিহ্ন দিয়ে দেবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু শরীহা আনসারী (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দাব্বাতুল আরদ নামক জীবটি তিনবার আত্মপ্রকাশ করবে। একবার ইয়ামন থেকে বের হবে, যার খ্যাতি সমগ্র মরুভূমি এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়ও তার আলোচনা হবে। এরপর একদিন সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারামে লোকেরা একত্রিত থাকবে, এমন অবস্থায় হঠাৎ "দাব্বাহ" আত্মপ্রকাশ করবে। মসজিদের সর্বদিকে অবস্থানরত লোকদেরকে দেখবে, লোকেরা তাকে দেখে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু একদল তার সম্মুখে অবিচল হয়ে থাকবে, তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়। "দাব্বাহ" তার মাথার উপর থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলবে এবং তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাদের চেহারা চিহ্নিত করবে, ফলে তাদের চেহারা তারকারাজির ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। এরপর সে জমীনের বক্ষ চিরে চলে যাবে, আর সে এত দ্রুত যাবে যে তাকে যে ধরতে চায় সে ধরতে পারবেনা, আর যে তার নিকট থেকে পলায়ন করতে চায় সে পলায়ন করতে সক্ষম হবে না। এরপর কিছু লোক এসে নামাজ পড়া আরম্ভ করবে, তখন তৃতীয়বার সে পেছন দিক থেকে হাযির হয়ে যাবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমি এখন নামাজ আদায় করছো? এরপর সে নামাজীদের সম্মুখে এসে তাদের মুখমন্ডলে চিহ্ন দেবে। এরপর লোকেরা সেখান থেকে সরে নিজ নিজ বাড়ী চলে যাবে। এরপর তারা একত্রিত হয়ে ভ্রমণ করবে, বিভিন্ন কথা-বার্তায় অংশ গ্রহণ

করবে, তবে কাফের এবং মোমেনের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে আর মোমেনকে মোমেন বলে এবং কাফেরকে কাফের বলে ডাকা হবে।

হযরত হোজায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে "দাব্বাহ"র আলোচনা যখন হয়, তখন আমি আরজ করলাম, দাব্বাহ কোথা থেকে বের হবে? তিনি এরশাদ করলেন, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ থেকে। আর এমন সময় বের হবে যখন হযরত ঈসা (রাঃ) তওয়াফে রত থাকবেন, জমিনে মৃদু কম্পন হবে, সাফা নামক পাহাড়ের পূর্বদিক বিদীর্ণ হবে এবং "দাব্বাহ" বের হয়ে আসবে, সর্ব প্রথম তার মাথা বের হয়ে আসবে, তাকে কেউ স্পর্শ করতে চাইলে তার নিকট পৌঁছতে পারবেনা, আর তার নিকট থেকে পলায়নকারী পলায়নও করতে পারবেনা। সে মানুষের মোমেন ও কাফের হওয়ার চিহ্ন দিয়ে দেবে। মোমেনের চেহারা তারকার ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে, আর তার দু'চোখের মধ্যখানে সে চিহ্নটি হবে, কাফেরের দু' চোখের মধ্যখানে যে চিহ্নটি হবে, তা কৃষ্ণ বর্ণের হবে। আর তাতে কাফের লিপিবদ্ধ থাকবে। (বগভী, এবনে জরীর)

আল্লামা বগভী (রঃ) সহল এবনে সালেহের পিতার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'বার তিনবার বলেছেন, হান্নাদের ঘাঁটিটি অত্যন্ত মন্দ। আরজ করা হলো ইয়া রসূলাল্লাহ! এমনটি কেন, তখন তিনি এরশাদ করেন, সেখান থেকে দাব্বাহ বের হবে এবং তিন বার অত্যন্ত বিকট চিৎকার দেবে যা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সকলেই শ্রবণ করবে, তার চেহারাটা হবে পুরুষের চেহারার ন্যায়। আর অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে পাখির ন্যায়। যে তাকে দেখবে তাকে সে বলবে, মক্কাবাসী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করেনি।

تُكَلِّمُهُمْ

'দাব্বাহ' মানুষের সাথে কথা বলবে, তফসীকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ সে বলবে, ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মমত বাতিল, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ সে একজনের ব্যাপারে বলবে, এ ব্যক্তি মোমেন। আরেকজন সম্পর্কে বলবে, এ ব্যক্তি কাফের। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যে কথাটি রয়েছে, তাই হবে তার কথা। আয়াতখানি হলো,

اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

"লোকেরা (কাফেররা) আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনতো না"।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, "দাব্বাহ" আরবী ভাষায় কথা বলবে, আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সে বলবে,

اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

"লোকেরা (কাফেররা) আমার আয়াত সমূহের উপর বিশ্বাস করতো না"।

দাব্বাহ মানুষকে এ সংবাদ দেবে যে, মক্কাবাসী কোরআনে করীম এবং কেয়ামতের উপর ঈমান আনেনি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'আয়াত' শব্দটির মাধ্যমে যে নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি নিদর্শন হলো, এ বিস্ময়কর জীবের আত্মপ্রকাশ। এছাড়া কেয়ামতের অন্যান্য আলামতও এ নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, দাব্বাহর আত্মপ্রকাশ তখন হবে, যখন মানুষ ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দেবে।

শেখ জালালুদ্দিন মহল্লী (রঃ) লিখেছেন, দাব্বাতুল আরদ এর আত্মপ্রকাশের সময় থেকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধের সময় শেষ হয়ে যাবে। এরপর আর কোন কাফের ঈমান আনবেনা, এমনি নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করবে যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেছিলেন, যে ঈমান এনেছে, এরপর আর কেউ তোমার জাতির মধ্য থেকে ঈমান আনবেনা।

হাদীসের আলোকে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, সর্ব প্রথম যে নিদর্শনটি প্রকাশ পাবে তা হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং দাব্বাতুল আরদ এর আত্ম প্রকাশ করা। এ দু'টি ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি প্রথম ঘটবে, তার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টিও ঘটবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত হোজায়ফা এবনে আমাদ গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমরা পরস্পর কথা বলছিলাম, ঠিক এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হলো। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছো? লোকেরা বললো, কেয়ামত সম্পর্কে। তখন তিনি এরশাদ করেন, কেয়ামত সে পর্যন্ত ঘটবে না যে পর্যন্ত তোমরা তার দশটি নিদর্শন না দেখবে। এরপর এরশাদ করেন, ধোঁয়া (যা আসমানকে ছেয়ে ফেলবে), দজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ঈসা এবনে মরিয়মের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া, তিনটি স্থান ধ্বসে যাওয়া-একটি প্রাচ্যে আরেকটি প্রতীচ্যে, আরেকটি জাযিরাতুল আরবে। অবশেষে ইয়ামন থেকে একটি অগ্নিকুন্ড বের হবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দাব্বাতুল আরদ যখন আত্ম প্রকাশ করবে, তখন তার নিকট মুসা (আঃ)-এর লাঠি এবং সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি থাকবে। মোমেনের চেহারার মধ্যে ঐ লাঠি দ্বারা চিহ্ন দেবে এবং চেহারা আলোকময় হয়ে যাবে, আর কাফেরের নাকের উপর চিহ্ন দেবে।

এরপর যখন লোকেরা একত্রিত হবে, তখন একে অন্যকে হে মোমেন! হে কাফের! বলে সম্বোধন কররে। (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা, হাকেম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন দাব্বাহ বের হবে, তখন সে মানুষের নাকের মধ্যে চিহ্ন দেবে, এরপরও মানুষ অনেক দিন জীবিত থাকবে, কোন কোন লোক জীব-জন্তু ক্রয় করে আনবে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এই জানোয়ার কার কাছ থেকে ক্রয় করেছ? সে বলবে, এমন ব্যক্তি থেকে যার দেহ মোহরাংকিত ছিল।

এবনে আবি শায়বা, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃত দিয়েছেন যে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট এই আকাংক্ষা পেশ করেছেন যে আমাকে দাব্বাতুল আরদ দেখানো হোক। তখন তিন দিন এবং তিন রাত একাধারে তা বের হতে থাকে এবং তার কোন একটি দিকও দেখা যাচ্ছিল না। তখন হযরত মুসা (আঃ) এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তাকে ফেরত নিয়ে নাও'। আল্লাহ পাক তাই তাকে ফেরত নিয়ে নিলেন।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে 'দাব্বাতুল আরদ' এসে প্রকৃত মোমেনদেরকে মুনাফেকদের থেকে পৃথক করে দেবে। যারা মুখে ঈমানের দাবীদার হবে প্রকৃত অর্থে ঈমানদার হবে না; বরং মুনাফেক হবে।[১]

يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

"আর স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করবো প্রত্যক সম্প্রদায় থেকে একেকটি দলকে, যারা আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যখ্যান করতো এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের বিবরণ রয়েছে। কেয়ামতের দিন সকল পাপীকে একত্রিত করা হবে। যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদের সকলকে হাযির করা হবে। তফসীরকারকগণ বলেছেন, এটি সেই সময় হবে যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে আদেশ দেবেন তোমার বংশধর থেকে দোযখের অংশ বের কর। তখন আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলকেই একত্রিত করা হবে।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"অবশেষে যখন তারা সকলেই উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অথচ সে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞান

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯ পৃঃ ৭৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃষ্ঠা-১০-১১
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৩৪

অর্জনও করোনি, নাকি তোমরা অন্য কিছু করেছিলে"?

পূববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, হাশরের ময়দানে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদেরকেও সে দিন হাযির করা হবে, তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড় করানো হবে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন সমূহের সত্যাসত্য বিবেচনা না করেই তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলে। নতুবা তোমরা আর কি করেছিলে বল? অর্থাৎ আমার নিদর্শন সমূহের সত্যাসত্য বিচার করার সুযোগ তোমাদের ছিল, কিন্তু তোমরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করোনি এবং আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলে; যদি তোমরা না করে থাক, তবে বল কি করেছিলে? সে দিন তাদের কাছে কোন ওজর-আপত্তি থাকবেনা, তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হবে তার কোন জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা, এমন অবস্থায় তাদের শাস্তি হবে অবধারিত। আর সে শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর এবং চিরস্থায়ী।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ
الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

তরজমা

(৮৫) সীমা লংঘনের কারণে তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; পরিণামে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

(৮৬) তারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি তাদের বিশ্রামের জন্যে রাত্রি এবং দেখা-শোনা করার জন্যে দিনকে সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বিশ্বাস করে।

(৮৭) এবং (সেদিনকে স্মরণ কর) যে দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। আল্লাহ পাক যাদের সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আসমান জমীনের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর দরবারে হাযির হবে বিনীত হয়ে।

(৮৮) আর এ পাহাড়-পর্বতকে তুমি অটল-অবিচল মনে করছো, কিন্তু সে দিন তারা মেঘের ন্যায় চলতে থাকবে। এটি আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য। তিনি সব কিছু করেছেন সুষম, নিশ্চয় তিনি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরাই কি আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলে? কেন করেছিলে? আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে তারা সেদিন এমন আযাবে গ্রেফতার হবে যে তারা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারবে না।

কাফেররা কথা বলতে পারবেনা

অথবা এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এভাবে প্রমাণিত হবে যে তারা নিরুত্তর হয়ে যাবে। অথবা অর্থ হলো তাদের কুফর ও নাফরমানীর পক্ষে পেশ করার মত কোন ওজর-আপত্তি বা বক্তব্যই তাদের কাছে থাকবে না। অথবা সে দিন তাদের কথা বলার কোন অনুমতিই থাকবে না। অথবা সে দিন তাদের মুখ সীল করা থাকবে। অথবা তারা এমনি আযাবে পতিত হবে যে, কোন কথা বলার জ্ঞানই থাকবেনা।[১]

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ

তৌহীদের আরেকটি দলিল

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের আহবান জানোনো হয়েছে।

আর এ আয়াতে পুনরায় তৌহীদের আরেকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ঈমান আনয়নের, কুফর ও নাফরমানী বর্জনের তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ يَرَوْا

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি তাদের বিশ্রামের জন্যে রাত্রি এবং দেখা-শোনা করার জন্যে দিনকে সৃষ্টি করেছি"?

বস্তুতঃ মানুষ যদি তার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত-অসীম কুদরত হেকমতের অগণিত নিদর্শন দেখতে পায়। আর এজন্যে মহাশূণ্যের দিকে তাকাবারও প্রয়োজন নেই। অহরহ দিবা-রাত্রির যে গমনাগমন হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ কত বিস্ময়কর! কোন্ মহাশক্তি দিন রাতকে এ নিয়মের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছে? আত্মভোলা মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে দয়াময় আল্লাহ্ পাক তার বিশ্রামের জন্যে রাতকে সৃষ্টি করেছেন আর দিনকে সৃষ্টি করেছেন তার কর্মের জন্যে, যেন দিনের আলোতে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭৮

সে তার কাজ কর্ম দেখতে পারে। আল্লাহ্ পাকই আলো আঁধারের প্রবর্তন করেছেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে"।

যেভাবে রাতের আঁধারের পর আসে দিনের আলো, ঠিক তেমনি কুফর ও শেরকের আঁধার ভ্রান্ত মত ও পথ এবং কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূত করার লক্ষ্যেই তৌহীদের আলো নিয়ে আগমন করেছেন নবী রসূলগণ।

লক্ষ্যনীয়, নিদ্রা শেষ হলে যেমন মানুষ নব জাগরণ, নব চেতনা এবং নব উদ্দীপনা লাভ করে এবং জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি মরণ-নিদ্রার পর কেয়ামতের দিন মানুষ নব-জীবন লাভ করবে।

আল্লাহ্ পাকই দুনিয়াতে মানুষকে রাত এবং দিনের মাধ্যমে কর্মের এবং বিশ্রামের সুযোগ দান করেছেন। তিনিই নিদ্রিত মানুষকে জাগ্রত করেন এবং নব-জীবনের স্পন্দন দান করেন। আর ঠিক এভাবেই মৃত্যু-নিদ্রার পরও মানুষকে তিনি কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করবেন। তাই দিবা-রাত্রির এ পরিবর্তনের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনিভাবে রয়েছে কেয়ামতের সত্যতার বাস্তব প্রমাণ, চিন্তাশীল বাস্তববাদী মানুষের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, রাতের পর দিনের এবং দিনের পর রাতের গমনাগমন একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে যিনি রাত ও দিনের পরিবর্তনকারী বা নিয়ন্ত্রক তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনিই মানব জাতির স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনিই মানুষের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনিই তাঁর বন্দাদেরকে তাদের নাফরমানীর শাস্তি দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যিনি আঁধারের পর আলো আনয়ন করেন তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পারেন। এভাবে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যেই আল্লাহ্ পাকের তৌহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য এ প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হতে পারে শুধু তারা, যারা ঈমানের সম্পদ দ্বারা ধন্য হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, রাত দিন তথা আলো এবং আঁধারের পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হচ্ছে তেমনি তাঁর ইচ্ছাতেই জীবন ও মৃত্যুও হচ্ছে, ঠিক তাঁরই কুদরতে এবং মর্জিতে হবে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন।[২]

বস্তুতঃ আখেরাতকে বোঝার জন্যে এ বিষয়টি অত্যন্ত উপকারী এ মর্মে যে রাতের নিদ্রা মৃত্যুরই নমুনা। নিদ্রিত হবার পর মানুষের খবরই থাকেনা।

আর একথা চির সত্য যে আল্লাহ্ পাকই মানুষকে নিদ্রিত করেন এবং জাগ্রত করেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭৯
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৪, পৃঃ ২১৯

ঠিক এমনিভাবে তিনিই মানুষকে মৃত্যু মুখে পতিত করেন। আর এভাবেই তিনি মৃত্যুর পরও মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন। মূলতঃ জীবন হলো স্বপ্নের ন্যায় আর কবর থেকে পুনরুত্থান হলো জাগরণ মাত্র। সময়ে সব কিছুই সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দেবে।[১]

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

"আর সে দিনকে স্মরণ কর, যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। আল্লাহ পাক যাদের সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত আসমান জমীনের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর দরবারে হাযির হবে বিনীত হয়ে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের সত্যতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে কেয়ামতের কিছু অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা

হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কেয়ামতের জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন। শুধু আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষা করছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে শিংগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এরশাদ করেন, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি! শিংগায় ফুঁৎকার দানকারী ফেরেশতা শিংগায় মুখ দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁর প্রতি শিংগায় ফুঁৎকার দেয়ার আদেশ হয়।

সাহাবায়ে কেরাম একথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন এজন্যে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যখন এ অবস্থা তখন আমাদের কি হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা বলঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ পাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট"। (আহমদ, হাকেম, বায়হাকী)

সায়ীদ এবনে মনসুর (রঃ) এবং বায়হাকী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জীব্রাঈল (আঃ) তাঁর অর্থাৎ হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর ডানে রয়েছেন আর মিকাঈল (আঃ) বামে রয়েছেন, আর ইস্রাফিলই শিংগায় ফুঁক দায়িত্বে রয়েছেন।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, সকল নবী রসূলগণের উম্মতের ওলামায়ে কেরামের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৭

মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে যে ইস্রাফীলই (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন।[১]

فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

"আসমান জমীনের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে"।

তবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের মর্জি হবে তারা ভীত হবে না। কোন কোন তফসীরকারের মতে তাঁরা হলেন জীব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল এবং আজরাঈল (আঃ)। তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেহুশ হবেন না। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন তাঁরা হলেন শহীদগণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে যে ইস্রাফিল (আঃ)-এর যে ফুঁকে সমগ্র বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে তা কি একটিই, নাকি ভিন্ন ভিন্ন। একদল তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে, ইস্রাফিল (আঃ) তিন বার শিংগায় ফুঁক দেবেন। প্রথমবার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সমগ্র বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় বার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ এ অবস্থায় যখন সকলেরই মৃত্যু হয়ে যাবে। তৃতীয় বার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলেই পুনর্জীবন লাভ করে কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। এ মত পোষণ করেছেন হযরত এবনে আরাবী (রঃ)।[২]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, শিংগায় দু'বারই ফুঁক দেয়া হবে। প্রথমে সমগ্র বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, এরপর সকলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। আর ঐ অবস্থায় যারা সংজ্ঞাহীন হবেন না তারা কারা? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একাধিক মত পোষণ করেছেন। আবু ইয়ালা, বায়হাকী এবং হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি এ সম্পর্কে জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন তারা হলেন শহীদগণ, তারা আল্লাহ পাকের আরশের কাছাকাছি রয়েছেন। আর ওলামায়ে কেরাম এর কারণ বলেছেন যে তারা আল্লাহ পাকের নিকট জীবিত রয়েছেন।

তফসীরকার কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) বলছেন, যারা সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়ার কারণে সংজ্ঞাহীন হবেন না তাঁরা হলেন জিব্রাঈল (আঃ), ইস্রাফীল (আঃ) এবং মালাকুল মওত (আঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি এরশাদ করেছেন, জিব্রাঈল, মীকাঈল, মালাকুল মওত, ইস্রাফিল (আঃ) এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭৮
২। তফসীরে এবনে আরাবী, খন্ড-২, পৃঃ ২১২
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭৮

আল্লাহ পাক যখন মানুষের রুহ কবজ করে নেবেন তখন মালাকুল মওতকে বলবেন, 'এখন আর কে বাকী রইলো'? তখন মালাকুল মওত বলবেন, 'হে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মানের অধিকারী! তুমি পবিত্র, তুমি কল্যাণময়, তুমি শ্রেষ্ঠতম। জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং মালাকুল মউত বাকী রয়েছে'। তখন আল্লাহ পাক আদেশ দেবেন, 'মীকাঈলের রুহ কবজ কর'। মালাকুল মওত তাই করবেন। মীকাঈল (আঃ) বিরাট পাহাড়ের মত পড়ে যাবেন। এরপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, 'এখন কে বাকী রয়েছে'? মালাকুল মওত আরজ করবেন, 'জিব্রাঈল এবং মালাকুল মউত। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'হে মালাকুল মওত! তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও'। সঙ্গে সঙ্গে মালাকুল মওতের মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'হে জিব্রাঈল! এখন কে রইল'? জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করবেন, 'হে পরওয়ারদেগার! তোমার পবিত্র সত্ত্বা যার কোন বিনাশ নেই, আর জিব্রাঈল (আঃ) বিদায় গ্রহণকারী'। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'তোমাকেও মৃত্যু বরণ করতে হবে'। তখন জিব্রাঈল (আঃ) সেজদায় পড়ে যাবেন (এবং ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হবে)।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ প্রথমে জিব্রাঈল এবং মিকাঈল (আঃ)-এর রুহ কবজ করা হবে, এরপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের, এরপর ইস্রাফীল এবং মালাকুল মওতের রুহ কবজ করা হবে।

আবুশ শায়েখ কেতাবুল আজমতে ওহাব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল এবং আজরাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন আর সর্বশেষে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর সর্ব প্রথম তাঁদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন। কেননা যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁদের উপরই অর্পিত।১

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, যারা শিংগায় ফুঁক দিলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হবেন না, তারা হলেন সেসব নেককার মোমেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

"যারা নেক আমল নিয়ে আসবে, তার চেয়ে উত্তম বিনিময় তারা লাভ করবে আর সেদিন তারা ভয়-ভীতি থেকে থাকবে নিরাপদ"।

একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত হবে মন্দ লোকদের ওপর। (আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত তখন সংঘটিত হবে, যখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলার মত কোন লোকই থাকবেনা। (আহমদ, মুসলিম, তিরমিজী)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন, কেয়ামত কায়েম

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৭৮

হবে, যখন কা'বা শরীফের হজ্জ করা হবেনা (কেননা হজ্জ পালনকারী কোন লোকই তখন থাকবেনা)। সে সময়ে আসবে কেয়ামত।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন কা'বা শরীফ এবং কোরআনে করীম উঠিয়ে নেয়া হবে তখন কেয়ামত আসবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে সমগ্র বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দিলে বিশ্ববাসী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে এবং তৃতীয় বার শিংগায় ফুঁক দিলে সকলে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হবে। আল্লাহ পাক যখন ইস্রাফীলকে প্রথম বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন আসমান জমীনের সকল অধিবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, শুধু সে সব লোক নিরাপদে থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপদে রাখবেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে) মায়েরা তাদের দুগ্ধ পোষ্য সন্তানদেরকে ভুলে যাবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। শিশুদের চুল সাদা হয়ে যাবে। ইবলিস শয়তান পালিয়ে বেড়াবে। এমনকি, সে পৃথিবীর এক প্রান্তে পৌঁছে যাবে। ফেরশতাগণ এসে তার মুখে প্রহার করতে করতে তাকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করবে, লোকেরা পালিয়ে বেড়াবে এবং একে অন্যকে ডাকতে থাকবে আর আল্লাহ পাক সেদিনকেই يوم التناد বা ডাকের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন, যারা কবরে থাকবে তারা জমিনের উপর কি ঘটছে সে সম্পর্কে অবগত হবেনা।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যাদেরকে আল্লাহ পাক ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখবেন, তারা কারা? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারা হলো শহীদগণ। তারা আল্লাহ পাকের নিকট জীবিত অবস্থায় থাকে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে রিয্‌ক প্রদান করা হয়। আল্লাহ পাক তাদেরকে সেই ভয়াবহ দিনের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন। এ বিপদ বিশেষতঃ তাদের জন্যে হবে, যারা সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে মন্দ তথা কাফের। কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করা হয়েছেঃ

(সূরা হজ্জ) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ

"হে মানব জাতি! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভীষণ ব্যাপার হবে"।

শিংগায় ফুঁক দেয়ার কারণে প্রথমতঃ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, পরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, এরপর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ পাকের মর্জি হবে, ততদিন সকলে ঐ অবস্থাতেই থাকবে, তবে যাদেরকে আল্লাহ পাক এ মহা বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তারাই শুধু নিরাপদ থাকবে।

মালাকুল মওত হযরত আজরাইল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজ করবেন, আসমান ও জমীনের সকল অধিবাসীর মৃত্যু হয়েছে, শুধু যাদেরকে তুমি রক্ষা করেছ তারাই নিরাপদ রয়েছে।[১]

হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) লিখেছেন, সর্ব প্রথম যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সকলের মৃত্যু হয়ে যাবে। এরপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে পুনর্জীবন লাভ করবে। এরপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে সকলে বেহুশ হয়ে পড়বে, এরপর শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে সকলে হুশ ফিরে পাবে এবং সতর্ক হবে।

তবে অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, শিংগায় দু'বারই ফুঁক দেয়া হবে, আর সকল অবস্থা এই দু'বারের শিংগায় ফুঁক দেয়ার মধ্যে প্রকাশিত হবে। প্রথম বার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তা ধীরে ধীরে শুরু হবে এবং তা সকলেরই ভয়ের কারণ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর তার আওয়াজ বিকট হতে থাকবে, তখন সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে, এমনকি তা এত ভয়াবহ হবে যে ঐ অবস্থায় সকলের মৃত্যু হয়ে যাবে এবং চল্লিশ বছর পর পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে সকল মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে।[২]

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ

"আর সকলেই তাঁর দরবারে হাযির হবে বিনীত হয়ে"।

অর্থাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আসমান জমীনের সকল অধিবাসী অত্যন্ত বিনীত এবং অসহায় অবস্থায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবে। আর এ হাযিরী হবে হিসাব-কিতাবের জন্যে, কবর থেকে উঠে সকলেই হাশরের ময়দানে হাযির হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

আর এ পাহাড়-পর্বতকে তুমি অটল অবিচল লক্ষ্য করছো, কিন্তু তারা সেদিন মেঘের ন্যায় চলতে থাকবে। অর্থাৎ মানুষ তো অত্যন্ত দুর্বল, এ বিরাট পাহাড়-পর্বত যা নিজ নিজ স্থানে স্থির, অনড়, অবিচল দেখা যাচ্ছে এবং চিরদিন এভাবে অবিচল থাকবে মনে হয়, কিন্তু কেয়ামতের দিন এ সুদৃঢ় পাহাড়গুলো মেঘের ন্যায় তীব্র গতিতে চলতে থাকবে। ধূনা তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, সেদিন কত ভয়াবহ হবে, তা এর দ্বারা সহজেই কিছুটা আঁচ করা যায়। তবে এ বিষয়ে আশ্চর্যন্বিত হবার কিছু নেই, কেননা এটি হলো আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের নিখুঁত নিদর্শন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ-৮৩-৮৪
২। তফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ-২৯২
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৩, পৃষ্ঠাঃ-২৪১
তফসীরে আদদুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ-১২৮
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-২০, পৃষ্ঠাঃ-৩০-৩১

মহিমাময় আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে অত্যন্ত বিচার-বিবেচনা করে সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। পাহাড়-পর্বতকে আজ অটল-অবিচল এবং সুদৃঢ় করে রেখেছেন। আবার তিনিই এগুলোকে ধূনা তুলোর ন্যায় উড়িয়ে দেবেন। এটি তাঁর কুদরতের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

নিশ্চয় তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। অতএব, কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য বিচারের ব্যাপারে কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। ইস্রাফীল (আঃ) সে দিন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে শিংগায় ফুঁৎকার দেবেন। সে সময় পৃথিবীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের বসবাস থাকবে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শিংগায় ফুঁক দিতে থাকবেন। ফলে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। শুধু মাত্র শহীদগণ নিরাপদ থাকবে। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের কাছে জীবিত রয়েছেন এবং তাদেরকে রিয্‌ক প্রদান করা হয়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 'এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন যে কত সময়ের মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে'? তিনি 'সুবহানাল্লাহ', অথবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অথবা এরূপই কোন বাক্য বিস্ময়ের সাথে পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, 'শুনুন আমার মন চায় এখন আর কারো কাছে কোন হাদীস বর্ণনা না করি। তবে আমি একথা বলেছিলাম যে শীঘ্র তোমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখতে পাবে। বায়তুল্লাহ বিনষ্ট হবে এবং এটা হবে ওটা হবে ইত্যাদি। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে 'আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জাল চল্লিশ অবস্থান করবে'। আমি জানি না দজ্জাল চল্লিশ দিন অবস্থান করবে না চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছর। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে অবতীর্ণ করবেন। তিনি আকৃতি এবং গঠনে ঠিক উরওয়াহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মত হবেন। তিনি দজ্জালকে খুঁজে বের করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর সাত বছর এমন অবস্থায় কেটে যাবে যে সারা দুনিয়ায় এমন দু' ব্যক্তি থাকবে না যাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক সিরিয়ার দিক থেকে এমন এক ধরনের ঠান্ডা মৃদু-মন্দ বাতাস প্রবাহিত করবেন যার দ্বারা সমস্ত মোমেন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে। একটি কণা পরিমাণও যার অন্তরে ঈমান থাকবে তারও রুহ কবজ করা হবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহাতেও প্রবেশ করে তবুও এই বাতাস সেখানে গিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবে। এবার পৃথিবীতে শুধু মন্দ লোকেরা থেকে যাবে। তারা পাখীর পালকের মত হালকা হবে এবং চতুঃষ্পদ জন্তুর মত নির্বোধ হবে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দের কোন পার্থক্যই থাকবেনা। তাদের নিকট শয়তান যাবে এবং মূর্তি পূজার জন্যে তাদেরকে প্ররোচনা দেবে, তারা মূর্তি পূজা শুরু করবে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে রিয্‌ক দান করতে

থাকবেন। তারা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকবে। আর এ অবস্থায় শিংগায় ফুঁক দেয়ার হুকুম হয়ে যাবে এবং যে যেখান থেকে এ আওয়াজ শ্রবণ করবে সেখানেই সে বিহ্‌বল হয়ে পড়বে। সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তি এ আওয়াজ শ্রবণ করবে যে তার উষ্ট্রের পানি পান করার জন্যে স্থান ঠিক করতে থাকবে। এমন সময় সে শিংগায় ফুঁকের আওয়াজ শুনবে এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। আর এভাবে সকলেই সংজ্ঞাহীন হতে থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক কুয়াশার ন্যায় বারিপাত করবেন, যার ফলে মানুষের দেহ তৈরী হতে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা উঠে দাঁড়াবে এবং তখনই ঘোষণা করা হবেঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে হাযির হও, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর এরশাদ হবে, অগ্নির অংশ বের কর। তখন বলা হবে, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন দোযখের অংশ। এটা হবে সেদিন যেদিন শিশুদেরকেও বৃদ্ধে পরিণত করা হবে। প্রথম শিংগায় ফুঁক হবে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দিলে সকলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে এবং সকলের মৃত্যু হয়ে যাবে। তৃতীয় বার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন রুহ সমূহ উড়তে থাকবে। মোমেনদের রুহ নূরানী হবে আর কাফেরদের অন্ধকারময়। আল্লাহ পাক তখন ঘোষণা করবেন, আমার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! প্রত্যেক রুহ যেন তাদের নিজ নিজ দেহে চলে যায়। যেভাবে বিষ মানুষের ধমনীতে প্রবেশ করে এভাবে রূহ সমূহ নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াবে, যেমন বলা হয়েছে যে সে দিন তারা কবর থেকে এত তাড়াতাড়ি বের হবে যেরূপ নিজেদের এবাদতের উদ্দেশে ছুটে যেতো। এই যে সুউচ্চ পাহাড় তোমরা যাকে স্থির এবং অবিচল দেখতে পাচ্ছ- এগুলো সেদিন উড়ন্ত মেঘমালার ন্যায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে দেখতে পাবে। অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের একটি নিদর্শন যার মর্মার্থ উপলব্ধি করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২১, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ
اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۭ هَلْ
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ
الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

তরজমা

(৮৯) যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে, সে তার চেয়েও ভাল ফল লাভ করবে। তারা সেদিন ভীষণ আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৯০) পক্ষান্তরে, যারা মন্দ (কুফর) নিয়ে আসবে, তাদেরকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করেছিলে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

(৯১) আমাকে এ আদেশই দেয়া হয়েছে যেন আমি এ নগরীর প্রতিপালকের বন্দেগী করি, যিনি এ নগরীকে করেছেন সম্মানিত, আর সব কিছু তাঁরই। আর আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

(৯২) আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি, অতএব যে ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করে, সে তার নিজেরই কল্যাণের জন্যে করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, (হে রসূল! আপনি) বলুন আমি তো শুধু সতর্ককারীদের একজন।

(৯৩) আর (হে রসূল!) আপনি (একথাও) বলুন, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যেই, অচিরেই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখাবেন, আর তোমরা তা চিনে নিতে পারবে (যা তোমরা এখন অস্বীকার করছো)। আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত, এর পাশাপাশি কেয়ামতের পূর্বের কিছু নিদর্শন সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। এ আয়াত থেকে কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের তথা বিচারের নীতি কি হবে, তার

ঘোষণা রয়েছে।

মানুষের দু'টি অবস্থা রয়েছে, একজন আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাসী, ঈমানদার এবং নেককার, আরেকজন অবিশ্বাসী, অবাধ্য এবং বদকার। যে ঈমানদার এবং নেককার, তার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ যে নেকী নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে।

নেক আমলের শুভ পরিণতি

এখানে দু'টি কথা রয়েছে, আলোচ্য আয়াতের الحسنة শব্দটি দ্বারা কোন্ নেকীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর উদ্দেশ্য হলো কলেমায়ে শাহাদাত।[১]

আবু মা'শার (রঃ) ইব্রাহীম (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এর অর্থ হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। অর্থাৎ যে তৌহীদে বিশ্বাস নিয়ে আসবে, সে তার শুভ পরিণতি লাভ করবে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা এখলাস উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ যে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কাজ করে, সে তার উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য। যারা এ গুণের অধিকারী হবে, তারা তার চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে।[২]

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় কথাটি হলো, যে ঈমান এবং নেক আমল নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে। উত্তম হওয়ার ভিত্তি কি হবে? আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনেই এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

অর্থাৎ একটি নেকীর বিনিময় হবে দশগুণ। আর হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যায় এরশাদ হয়েছেঃ একটি নেক আমলের সওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত হতে পারে। আর এ সওয়াব বা প্রতিদান কখনও শেষ হবার নয়।

দ্বিতীয়তঃ ঈমান ও নেক আমল একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে, অথচ তার বিনিময়ে যে সওয়াব লাভ হবে তা ক্ষণস্থায়ী হবে না হবে চিরস্থায়ী, এ অর্থেও সকল নেক আমলের শুভ পরিণতি বা সওয়াব হবে উত্তম।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

ঈমানদার ও নেককারগণ শুধু যে উত্তম বিনিময় লাভ করবে তাই নয়; বরং তারা কেয়ামতের দিনের মহা বিপদ থেকেও নিরাপদ থাকবে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে,

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২২১
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৫

কেয়ামতের মহা বিপদ থেকে শুধু যে আল্লাহর রাহের শহীদগণই নিরাপদ থাকবে তাই নয়; বরং যারা ঈমানদার ও নেককার, আল্লাহ পাকের প্রিয়, পছন্দনীয় এমন বন্দাগণও ঐ মহা সংকট থেকে নিরাপদ থাকবে।[১]

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

"পক্ষান্তরে, যারা মন্দ (কুফর) নিয়ে আসবে তাদেরকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে"।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাকে, কুফর-শেরক সহ যাবতীয় অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে দোযখের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হবে। এ শাস্তি যত কঠোরই হোক না কেন, তাদের প্রতি অবিচার নয়; বরং তাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং অনিবার্য প্রতিফল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"তোমরা যা করেছিলে, তারই পরিণতি তোমাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে"।

একথা তখন তাদেরকে বলা হবে।

এখানে উল্লেখ্য, শেরকের চেয়ে বড় কোন পাপ নেই, আর দোযখের চেয়ে কঠিন কোন শাস্তি নেই, তাই যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে, তাদের উপযুক্ত স্থান দোযখই। তাই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দুনিয়া আখেরাত কেয়ামত এবং কেয়ামতের আলামত সমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং আখেরাতের বিচারের নীতিও ঘোষণা করা হয়েছে। এখন এ সূরার শেষ পর্যায়ে তিনটি বিধান পেশ করা হচ্ছেঃ

(এক) শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা,

(দুই) দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা,

(তিন) পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করা।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও পেশ করা যায় যে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঈমান ও হেদায়েতের কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! আপনি মানুষকে দ্বীন ইসলামের তবলীগ করেছেন, সত্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন, অতএব এখন আল্লাহ পাকের এবাদতে আত্মনিয়োগ করুন, এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন, যারা

১। তফসীসে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৩
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৬

আপনার বিরোধিতা করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا أُمِرْتُ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আমি শুধু তাঁরই বন্দেগী করি, যিনি এই মহানগরী মক্কার মহান অধিপতি।

الَّذِي حَرَّمَهَا

অর্থাৎ তিনিই সেই প্রতিপালক যিনি এ শহরকে সম্মানিত করেছেন, যিনি এ শহরকে চিরকালের জন্যে নিরাপদ শহর হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যেখানে কোন প্রকার জুলুম করা হয় না, লুণ্ঠন করা হয় না, যেখানে কোন বৃক্ষ কাটা হয়না, এমনকি যে মহানগরীর ঘাস পর্যন্ত কাটার অনুমতি নেই।

এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক মক্কার কোরায়েশ গোত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ এহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দয়াময় আল্লাহ্ পাক দয়া করে তোমাদের এ শহরকে সর্বপ্রকার ফেতনা-ফাসাদ এবং অশান্তি থেকে নিরাপদ করেছেন। তাঁর তরফ থেকে আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন শুধু তাঁরই বন্দেগী করি।

وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

ত্রিভূবনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁরই মালিকানা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এ শহর মক্কায়ে মোয়াজ্জমারও মালিক তিনিই। আর তিনিই আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি শুধু তাঁরই বন্দেগী করি, আর আমি যেন শুধু তাঁরই অনুগত হয়ে থাকি।

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ

আর আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, আমি যেন শুধু আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থেকেই ক্ষান্ত না হই; বরং আল্লাহ্ পাকের বন্দাদের কল্যাণের জন্যে তাদেরকে পবিত্র কোরআন শোনাতে থাকি অর্থাৎ এবাদত হিসেবেও পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করি। আর মানুষকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের আহবান করার লক্ষ্যেও পবিত্র কোরআন পাঠ করি এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পৌঁছাতে থাকি।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের শুরুতে قل শব্দটি গুপ্ত রয়েছে, অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে আমার উপর এ আদেশ হয়েছে, আমি যেন শুধু এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করি, সর্বদা তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করি এবং পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করতে থাকি, এবাদত হিসেবেও এবং তোমাদের প্রতি সত্যের দাওয়াত হিসেবেও।

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

(যে কেউ হেদায়েত গ্রহণ করবে, সে তার নিজের উপকারার্থেই করবে।)

অর্থাৎ যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দেবে, এক

আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করবে, সে তার নিজেরই কল্যাণ সাধনা করবে।

وَمَنْ ضَلَّ

পক্ষান্তরে, যে পথভ্রষ্ট হবে, যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে না, সে তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে।

فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তো সতর্ককারীদের একজন, আমার কাজ শুধু তোমাদেরকে সাবধান করা, আমি এ কর্তব্য সম্পাদন করেছি, মানা না মানা তোমাদের কাজ, তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা আমার কাজ নয়। কেউ পথভ্রষ্ট হলে তার জন্যে আমাকে জবাবদেহী করতে হবে না।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

আর (হে রসূল!) আপনি একথাও বলুন যে সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্যেই, যিনি আমাকে নবুওয়্যত ও রেসালতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং তবলীগ ও দাওয়াতের যে দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পণ করেছেন, তা সঠিক ভাবে পালন করারও তৌফিক তিনি দিয়েছেন, এজন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকর আদায় করি।

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا

অচিরেই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখাবেন, আর তোমরা তা চিনে নিতে পারবে যা তোমরা এখন অস্বীকার করছো।

তফসীরকারকগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ যে সব নিদর্শন পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে, সেগুলোর প্রতি آيات শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া, ফেরেশতাদের নাজিল হওয়া, মুসলমানদের সাহায্য করা, কাফেরদের আহত করা, তাদের পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করা, চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা, কংকর সমূহের তছবিহ পাঠ করা এবং শেষ যমানায় কেয়ামতের পূর্বে "দাব্বাতুল আরদের" বের হয়ে আসা- এসব কিছুর প্রতিই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَتَعْرِفُونَهَا

তোমরা ঐসব নিদর্শন চিনতে পারবে, কিন্তু তখন তার দ্বারা কোন ফায়দা হবে না। কেননা তখন আর হেদায়েত গ্রহণের সময় থাকবেনা। তখন সকলেই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে, কিন্তু সে বিশ্বাস তাদের জন্যে কোন উপকারে আসবেনা।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন। তোমরা মনে করোনা

যে তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাকের অজানা রয়েছে, তা কখনো নয়; বরং পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দান করবেন, আর তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, এনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل= خلوت ولكن قل على رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب

"যখন তুমি কখনো একাকী হও, তখন কিন্তু নিজেকে একা মনে করোনা; বরং আল্লাহ পাককে সেখানেও হাযির নাজির জানবে। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও তোমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই"।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৬ই জুন মোতাবেক ২৬ জিলহজ্জ ১৪১৪হিঃ রাত ১১.০০টায় সূরা নাম্‌লের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনাকে এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা কাসাস

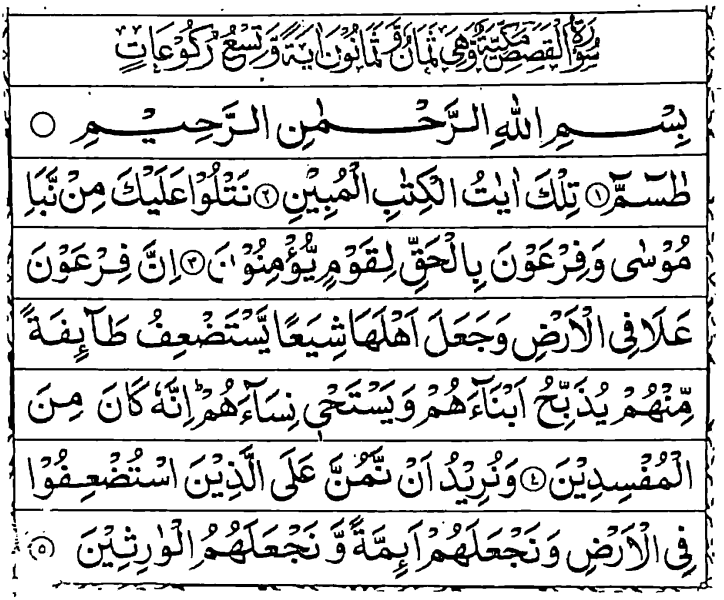
سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٍ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰسٓمٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ

مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③ اِنَّ فِرْعَوْنَ

عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً

مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ

الْمُفْسِدِيْنَ ④ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا

فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑤

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে (শুরু করছি)

তরজমা

(১) তোয়া, সীন, মীম।

(২) এ আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের।

(৩) (হে রসূল!) মোমেন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আমি আপনার নিকট মুসা এবং ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে বর্ণনা করছি।

(৪) নিশ্চয় ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং দেশের অধিবাসীদেরকে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলো, তাদের এক শ্রেণীকে সে দুর্বল করেছিলো, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।

(৫) আর আমি ইচ্ছা করলাম সে যাদেরকে দুর্বল করেছিলো, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে।

সূরা কাসাস প্রসঙ্গে

সূরা কাসাস মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮৮। রুকু ৯।

হযরত হাসান বসরী (রঃ), তাউস (রঃ), একরামা (রঃ) বলেছেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এতে একখানি আয়াত মাদানী রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ ..... لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ

পর্যন্ত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফ এবং জুহফার মধ্যস্থলে।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আহমদ, তেবরানী হযরত মাদীকারব (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আমরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের নিকট হাযির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খোবাব এবনে আরত (রাঃ)-এর নিকট যাও, তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর, কেননা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ সূরা শিখিয়েছেন।[২]

এ সূরায় হযরত মুসা (রাঃ)–এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কারুণের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদয়ানে পৌঁছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সম্মান মর্যাদা ও আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে, এরপর যখন তিনি পুনরায় মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যত ও রেসালাত প্রদানে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা নাম্‌লের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর সূরার শেষে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কোরআনের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ৪১
২। তফসীরে আদ্‌দুরুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৩০

সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরার শুরুতেই পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরা নাম্‌লে যেভাবে নবী রসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তৌহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখেরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার পর তৌহীদের দলিল-প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৌহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা শেষ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনি এ সূরায় বিস্তারিত ভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল, কিন্তু সে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মোজেযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। অথবা বলা যায়, ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মুসা (আঃ)–এর বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ গ্রহণের তৌফিক দান কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, ফেরাউন ছিলো ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ, আর কারুণ ছিলো ধন-সম্পদের মোহে আত্মহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়। পবিত্র কোরআন বিশ্ব-মানবের সম্মুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়, এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কোরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কোরআনের অবদান অসামান্য।

তফসীরুল কোরআন

طٰسٓمٓ

তোয়া, সীন, মীম।

এগুলোকে মোকাত্তায়াত বলা হয়। এ অক্ষরগুলোর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

এ আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের। যে কিতাব তথা পবিত্র কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির সতর্কবাণী সহ পূর্বকালের অনেক ঘটনাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, আর এটিই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেহেতু পবিত্র কোরআনে যাবতীয় বিধি-নিষেধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, আর এতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা নেই, এ কারণেই পবিত্র কোরআনকে 'আল কিতাবুল মুবীন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

(হে রসূল!) মোমেন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আমি আপনার নিকট মুসা এবং ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।

ফেরাউন ছিল অহংকার এবং আত্মম্ভরীতার মূর্ত প্রতীক, সে বণী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিলো, আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে তার হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করলেন, কিন্তু সে হেদায়েত গ্রহণে প্রস্তুত হলোনা, তার ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, অবশেষে হযরত মুসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করলেন, ফেরাউন তার দলবল নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। সম্মুখে ছিল লোহিত সাগর, আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)–এর মোজেযা স্বরূপ লোহিত সাগরের মাঝে পথ নির্মাণ করে দিলেন এবং হযরত মুসা (আঃ)–এর নেতৃত্বে বণী ইসরাঈল জাতি লোহিত সাগর অতিক্রম করলো। আর ঐ পথেই লোহিত সাগরে ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি হয়েছিল। সেদিন ফেরাউনের হাতে নির্যাতীত বণী ইসরাঈল জাতি পেয়েছিল মুক্তি, লাভ করছিল শান্তি এবং সাফল্য। ঠিক এমনিভাবে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অল্প সংখ্যক মুসলমান ছিলেন কাফেরদের হাতে নির্যাতীত- উৎপীড়িত। যেভাবে হযরত মুসা (আঃ)–এর বরকতে বণী ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেয়েছিল, ঠিক তেমনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে মুসলমানগণও বিজয় লাভ করবেন, আলোচ্য বর্ণনায় এ সুসংবাদও রয়েছে। অতএব, মক্কার কোরায়েশদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করা এবং আল্লাহ পাককে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ মুসা ও ফেরাউনের এ ঘটনা মোমেনদের উদ্দেশেই বর্ণিত হচ্ছে। কেননা যারা ঈমানদার, শুধু তারাই এ ঘটনা দ্বারা উপকৃত হবে। যাদের ঈমান নেই, তারা এর দ্বারা কোন ফল পাবেনা। যে ঈমানদার, তার ঈমান সুদৃঢ় হবে এ ঘটনা জানার মাধ্যমে।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا

"নিশ্চয় ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং দেশের অধিবাসীদেরকে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল"।

ফেরাউনের গর্ব এবং অহংকারের অন্ত ছিল না। ঐ অহংকারের কারণেই সে খোদায়ী দাবী পর্যন্ত করেছিল, সে তার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্যে মিসরের জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। কিবতীরা ছিল ফেরাউনের জাতি। আর বণী ইসরাঈলরাও সে দেশের অধিবাসী ছিল। ফেরাউন বণী ইসরাঈলকে অত্যন্ত নির্যাতীত ও উৎপীড়িত অবস্থায় রেখেছিলো এবং তাদের উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে রেখেছিলো।

বর্ণিত আছে যে ফেরাউন একবার স্বপ্ন দেখেছিলো, ব্যাখ্যাকাররা ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলো, বণী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তির হাতেই তোমার ধ্বংস আসবে।

এ কারণেই ফেরাউন আদেশ দিল যে বণী ইসরাঈলের প্রতিটি নবজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা কর। আর এ আদেশের কারণে বণী ইসরাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো। আলোচ্য আয়াতে الارض শব্দটি দ্বারা মিসরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু ফেরাউন মিশরের জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছিলো, তাই যখন যাকে ইচ্ছা তার দ্বারা সে কাজ হাসিল করতো আর প্রত্যেকেই তার তাবেদারী করতো। সে শুধু তার স্বজাতি কিবতীদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন করে রেখেছিলো, আর বণী ইসরাঈলকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো।

অথবা এর অর্থ হলো, ফেরাউন জনগণকে তার সেবার জন্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছিলো, যে যে কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত, তার দ্বারা সে কাজই আদায় করতো।

অথবা এর অর্থ হলো, ফেরাউন মিশরের অধিবাসীদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে রেখেছিলো, যাতে করে তারা ফেরাউনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে।

يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

এক শ্রেণীকে সে দুর্বল করেছিলো, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। যাদেরকে ফেরাউন দুর্বল করে রেখেছিলো তারা ছিল বণী ইসরাঈল জাতি, তাদেরকে সে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করেছিলো, তাদের উন্নতির পথ বন্ধ করে রেখেছিলো।

যে গণক ফেরাউনকে এ সংবাদ দিয়েছিলো যে বণী ইসরাঈলে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যে তোমার রাজত্বকে ধ্বংস করবে, যদি ঐ গণকের কথা সত্য হয় তবে ফেরাউন বণী

ইসরাঈলের সন্তানদেরকে যে পাইকারী হারে হত্যা করেছে তা তার কোন কল্যাণেই আসতে পারেনা, কেননা অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডন, যা আল্লাহ পাকের মর্জি তাই হয় কার্যকর। আর যদি ঐ গণকের কথা মিথ্যা হয়ে থাকে, তবে এ জুলুম-অত্যাচার ও হত্যাকান্ড ছিলো সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং অমার্জনীয় অপরাধ। পবিত্র কোরআনে পরবর্তী বাক্যে ফেরাউনের পরিচয় বর্ণনা করেছেঃ

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

নিশ্চয় ফেরাউন ছিলো অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্যতম। তার কাজই ছিলো অন্যায়-অনাচার-জুলুম-অত্যাচার, অশান্তি সৃষ্টি করা। এজন্যেই তার জল্লাদরা বণী ইসরাঈলের ঘরে নবজাত শিশুর খোঁজে ব্যস্ত থাকত। জন্ম লগ্নেই তাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবেহ করে ফেলত এবং মেয়েদেরকে ছেড়ে দিত, এ অবস্থা বহুদিন অব্যাহত ছিলো। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এভাবে ফেরাউন বনী ইসরাঈলের নব্বই হাজার শিশুকে হত্যা করেছে।[১]

ফেরাউন বণী ইসরাঈলের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছিলো, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিলো মজলুমদেরকে সাহায্য করা এবং বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে বিপদ মুক্ত করা এবং জালেমের স্থলে তাদের উপর দেশ ও জাতির ক্ষমতা অর্পণ করা।

এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

"আর আমি ইচ্ছা করলাম সে যাদেরকে দুর্বল করেছিলো, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হিজরতের সময় মিসর অতিক্রম করছিলেন, তাঁর স্ত্রী সারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখনকার রাজা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো এবং তার বাঁদী বানাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাক ঐ কাফেরের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়, সে তাঁর নিকট দোয়া প্রার্থী হয়। তাঁর দোয়ার ফলে আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ করেন, সে তখন খুশী হয়ে তাঁর খেদমতের জন্যে হাজেরা নামক একটি বাঁদী উপহার দেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমার বংশধরদের মধ্যে এক ব্যক্তির হাতে মিসরের ক্ষমতা আসবে। বর্তমানে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে অপমানিত অবস্থায় ধ্বংস করা হবে। এ বর্ণনা যুগ যুগ ধরে প্রচারিত হতে থাকে। শুধু যে বণী ইসরাঈল এ সম্পর্কে অবগত ছিলো তাই নয়; ফেরাউনের জাতিও এ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলো, যে কারণে ফেরাউন নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়, কিন্তু আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই কার্যকর হয়। তাই হযরত মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে ফেরাউনের গৃহেই তাঁর লালন-পালনের

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১, পৃঃ ২৯৬-৯৭

ব্যবস্থা করেন, যার ভয়ে নিঃস্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল, আল্লাহ্ পাক তার দ্বারাই তাঁকে লালন-পালন করান।[১]

وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

"আমি চেয়েছিলাম মজলুম বণী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের জুলুম থেকে রক্ষা করি"।

শুধু তাই নয়,

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

"আর আমি চেয়েছিলাম তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং মজলুম বণী ইসরাঈলকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে"।

আল্লাহ্ পাক তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করলেন, নিপীড়িত-নির্যাতীত বণী ইসরাঈলকে তিনি উদ্ধার করলেন। বণী ইসরাঈলকে মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করলেন, আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি হলো লোহিত সাগরে। আলোচ্য আয়াতের ائمة শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ধর্মীয় নেতৃত্ব বণী ইসরাঈলকে অর্পণ করবেন। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজত্ব। অর্থাৎ বণী ইসরাঈলকে ফেরাউনের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এখানে উল্লেখ্য, ফেরাউনের এ ঘটনা ইতিপূর্বে সূরায়ে শুআরা এবং সূরায়ে নাম্‌লে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে ছিল এর উল্লেখ। আলোচ্য সূরায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে শুআরা এবং সূরায়ে নাম্‌লে যে সব দিকের উল্লেখ হয়নি, সেসব দিকে এ সূরায় আলোকপাত করা হয়েছে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ১৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৯
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১৯, পৃঃ ১০৪-৪২
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১১৩

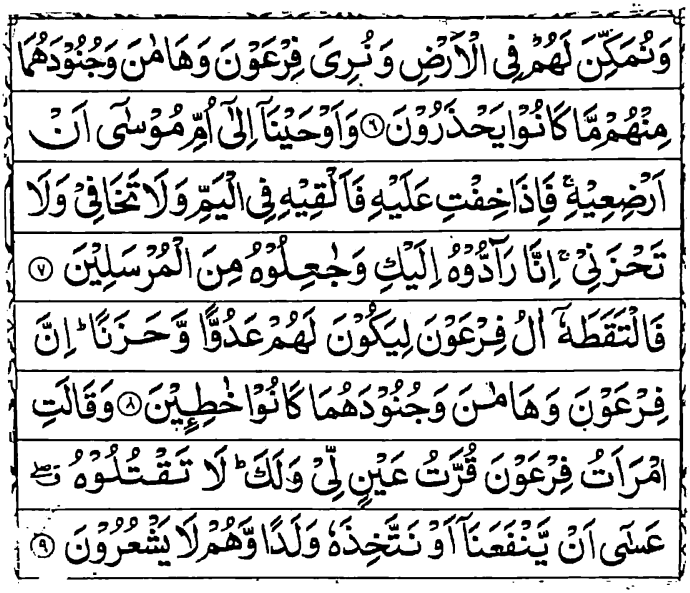
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝٨ وَقَالَتِ
امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ
عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٩

তরজমা

(৬) আর আমি চেয়েছি তাদেরকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর আমি ফেরাউন, হামান ও তাদের আশংকাকে সত্য করে দেখাতে চেয়েছি।

(৭) আর আমি মুসা-জননীকে নির্দেশ প্রদান করি যে তুমি শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে, তখন তাকে সাগরে ফেলে দিও এবং ভয় করোনা, দুঃখবোধও করোনা, নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রসূলগণের একজন করবো।

(৮) এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে করে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিলো।

(৯) আর ফেরাউনের স্ত্রী বলে, এ যে আমার এবং তোমার নয়নের মনি, তাকে হত্যা করোনা, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। মূলতঃ তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বণী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে,

আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বণী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিসরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশংকা করছিল যে বণী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশংকা বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা থাকে অটুট।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে হামান ছিলো ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ব্যাপারে তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিলো সিদ্ধহস্ত।

مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ

"যে বিষয়ে তারা ভয় করছিল" অবশেষে তাই হলো।

অর্থাৎ গণকরা ফেরাউনকে সংবাদ দিয়েছিলো যে বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির হাতে তোমার ধ্বংস অনিবার্য, সে আশংকাই আল্লাহ পাক তাদের চোখের সম্মুখে সত্যে পরিণত করলেন, নিরপরাধ বণী ইসরাঈলের শিশু সন্তানদেরকে যার ভয়ে রক্ত পিপাসু ফেরাউন হত্যা করছিলো, সেই শিশু মুসাকেই আল্লাহ পাক রাজকীয় সম্মানে, সম্পূর্ণ নিরাপদে তার দ্বারাই লালন-পালন করিয়ে প্রমাণ করলেন যে ফেরাউন ছিলো আল্লাহ পাকেরই একজন গোলাম, ক্ষমতাদর্পে যদিও সে অবাধ্য হয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সম্মুখে শুধু যে সে অসহায় নিরূপায় হয়েছে তাই নয়; বরং চিরতরে হয়েছে সে নিশ্চিহ্ন। পবিত্র কোরআন এ ঘটনা উপস্থাপন করে বিশ্ব-মানবকে শিক্ষা গ্রহণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানিয়েছে।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

"আর আমি মুসা-জননীকে নির্দেশ দিলাম তুমি শিশুটিকে দুগ্ধ পান করাও"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের اوحينا শব্দটি وحى থেকেই নিস্পন্ন, তবে এই ওহী নবুওয়্যতের ওহী নয়, কেননা কোন স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তফসীকার কাতাদা (রঃ) এজন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, "আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম"-সুফীবাদের ভাষায় এটিকে এলহাম বলা হয়। আর এলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপ্ন যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে এলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা।[১]

যারা পূণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক এলহাম করেন এবং

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ২০
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ৪৪

তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতাকে এলহাম বা স্বপ্ন বা অন্য কোন পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেনঃ

أَنْ أَرْضِعِيهِ

"শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক"।

শিশু মুসা (আঃ) কখনও কাঁদতেন না

হযরত মুসা (আঃ) তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন, এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মাতা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুগ্ধ পান করাতেন, কখনও তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়া-চড়াও করতেন না, এ বিবরণ দিয়েছেন আল্লামা বগভী (রঃ)।[১]

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

"যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা কর, তখন তাকে সাগরে ফেলে দাও এবং ভয় করোনা, দুঃখও বোধ করোনা। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রসূলগণের একজন করবো"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-এর মাতাকে একথাও বললেন, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের ব্যাপারে আশংকা কর, তখন তাকে একটি বাক্সে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশংকা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়োনা, কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌঁছে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবোনা, বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রসূল হিসেবেও মনোনীত করবো।

আলোচ্য আয়াতের الْيَمِّ শব্দটি দ্বারা মিসরের নীল নদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাততঃ তুমি তাকে নীল নদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে দেব।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

তফসীরকার আতা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মিসরে যখন বণী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তারা মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তারা ভাল কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, বণী ইসরাঈল গোলামে পরিণত হলো, তারা তাদেরকে বেগার খাটাতে লাগলো, এ অবস্থা বহুদিন অব্যাহত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৯১

রইলো, অবশেষে আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ)-কে নবী করে প্রেরণ করলেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা এই, যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্ম গ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা চর নিযুক্ত করে রেখেছিলো। যে বাড়ীতে কোন শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে সেই নবজাত শিশুর সংবাদ দেয়া। এর ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মুসা-জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথা সময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে অবস্থা তা তুমি জান তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই। যাহোক, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাঁকে কোলে নিল। তখন মুসা (আঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর মুসা (আঃ)-এর মায়া মহব্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। সে মুসা (আঃ)-এর মাতাকে বললো, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল, অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্যে এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি, এজন্যে আমি বলি তোমার পুত্রের হেফাজত কর। এরপর যখন ধাত্রী হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘর থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিলো। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ দ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন মুসা (আঃ)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মুসা (আঃ)-এর বোন তাকে একটি কাপড় জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করলো। চুলোয় তখন অগ্নি ছিল। কিন্তু সৈন্যদেরকে দেখা মাত্র সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভেতরে প্রবেশ করলো, চুলোয় আগুন জ্বলছিল, মুসা (আঃ)-এর মাতার চেহারায় কোন ভাবান্তর হলোনা। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করলো, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মাতা দেখলেন এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে। শিশু মুসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগলো, তখন তিনি তাঁর পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে এলহাম করলেন যে শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দাও।

আলোচ্য আয়াতে এ কথাটিই বলা হয়েছেঃ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ

অর্থাৎ আমি মুসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীল নদে ভাসিয়ে দাও। মুসা (আঃ)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিস্ত্রিকে বাক্স তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বললো, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মুসা-জননী মিথ্যা বললেন না। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করলো, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেয়ার জন্যে হাযির হলো। সে কিছু বলতে চাইলো কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বোঝাতে চাইলো, কিন্ত যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দেয়। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করলো, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। তখন পুনরায় সে সৈন্যদের নিকট হাযির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল, অবশেষে লোকেরা তাকে প্রহার করে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাটতে হাটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো, যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনও সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বন্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ তাকে মুসা (আঃ)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে সব কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়েছে।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতা যখন অন্তসত্ত্বা হলেন, তখন তিনি তাঁর অবস্থা গোপন রাখলেন, কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলোনা, যেহেতু আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের প্রতি এহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মুসা (আঃ)-এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন।

এখানে উল্লেখ্য, যখন বণী ইসরাঈলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির তরফ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। কিবতীদের তরফ থেকে উত্থাপিত এ দাবীর প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বণী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছর হযরত হারুন (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিলো

সে বছরই হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বণী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করতো, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতার দেহে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মরিয়ম ব্যতীত আর কেউ জানতেই পারলোনা। আল্লাহ্ পাক মুসা (আঃ)-এর মাতার অন্তরে একথার এলহাম করলেন যে তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোন প্রকার আশংকা হয়, তখন তাকে নীল নদে ভাসিয়ে দিও। মুসা (আঃ)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মুসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়া-চড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসা-জননীর আশংকা হলো যে ফেরাউনের লোকেরা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরী করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে ফেরাউনের শুধু একটি কন্যা সন্তান ছিলো, পুত্র সন্তান ছিলোনা। ঐ কন্যা সন্তানটিও শ্বেত রোগে আক্রান্ত ছিলো, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। যাদুকররা বলেছিলো, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীল নদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোন প্রাণী এ নীল নদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায় তবে শ্বেত রোগাক্রান্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হবার সময়। ঐ দিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীল নদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরী করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়া বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ অসুস্থ কন্যাটিও ছিলো। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেলো, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচারকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পায়নি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, ভেতরে একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁর রিযক তাঁর আঙ্গুল সমূহরে মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করতো, এ নিঃস্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহ মায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেত রোগগ্রস্ত দেহে মর্দন করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করলো। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

"এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে হযরত মুসা (আঃ) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন।

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَٰطِئِينَ

"নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিলো"।

আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিলো। যেমন মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিঃস্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দ্বিতীয়তঃ শিশু মুসাকে তারা নীল নদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়ীতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীতে যা হবার তা হয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজার হাজার নিঃস্পাপ শিশুকে হত্যা করার মত বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ্ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মুসা (আঃ)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সে শিশুটিকে আল্লাহ্ পাক তার বাড়ীতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন-পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।[১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতংকিত ছিলো, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান করে নিয়েছে এবং তার বুকের উপর বসে গেছে। আর নিরাপদে নিঃশংক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছে। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খন্ডন করতে পারেনা, এ ঘটনা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদেরিয়া" তকদীরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীজ (রঃ) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত তকদীরকে খন্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয়না।[২]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বললো, এটিই

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৯১-৯৫
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ১৭-১৮
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ২০-২১
২। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ২০

সে শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতংকগ্রস্ত, এটি নিঃসন্দেহে বণী ইসরাঈলের সন্তান, তোমার ভয়ে তাকে নীল নদে ফেলে দেয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ

"আর ফেরাউনের স্ত্রী বলে, এ যে আমার এবং তোমার নয়নের মনি, তাকে হত্যা করোনা"।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বললো, শিশুটি এখনও কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রসূলগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীলা। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করলো তখন তিনি বললেন,

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ

সে আমার এবং তোমার নয়নের মনি, তাকে হত্যা করোনা। ফেরাউন বললো, তোমার নয়নের মনি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি ফেরাউন একথা বলতো, সে যেমন তোমার নয়নের মনি, আমার জন্যেও শান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত করতেন।

আছিয়া ফেরাউনকে বলেন, শিশুটিকে আমাকে দিয়ে দাও, এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরও বলেন,

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

"সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি"।

তফসীরকারকগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু মুসা (আঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু মুসার (আঃ)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরও বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছ, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারে, বিশেষতঃ আমাদের নিকট লালিত-পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ
لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑩
وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ⑪ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ
نٰصِحُوْنَ ⑫ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑬

তরজমা

(১০) আর মুসা-জননীর মন অস্থির হয়ে পড়ে (পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে) সে মুসার অবস্থা প্রকাশ করে দেয়, যদি আমি তার অন্তরকে (আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাসী থাকার প্রতি অটল-অবিচল না রাখতাম।

(১১) সে মুসার ভগ্নিকে বললো, মুসার অনুসরণ কর, ফলে সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু তারা টেরও পায়নি।

(১২) আমি পূর্বেই মুসাকে ধাত্রী স্তন্য পানে বিরত রেখেছিলাম। তাই মুসার ভগ্নি বললো, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব যারা তোমাদের হয়ে তার লালন-পালন করবে এবং তার কল্যাণকামী হবে।

(১৩) এভাবেই আমি ফিরিয়ে দিলাম তাকে তার মায়ের কাছে যাতে তার নয়ন জুড়ায়, সে দুঃখিত না হয় এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে আল্লাহ পাকের কথা চির সত্য, কিন্তু অনেকেই তা জানে না।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে মুসা-জননী তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রটিকে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন, কিন্তু মন যে তার কোনভাবেই মানেনা, হায়! যদি পানির স্রোতে সে হারিয়ে যায়, যদি ডুবে যায় এ অসহায় শিশু, অস্থির এবং ব্যাকুল হয়ে পড়েন তাই মুসা-জননী। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। যদি আল্লাহ পাক তাঁর মনকে অটল অবিচল না রাখতেন, তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সুদৃঢ় না রাখতেন তবে পুত্র শোকে

কাতর মায়ের অধৈর্য মন হয়তো বা সকল রহস্য ফাঁস করে দিতো। মুসা-জননীকে আল্লাহ্ পাক এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 'তাকে তোমার কোলে আবার ফিরিয়ে দেব'-একথা মনে করেই তিনি তাঁর ধৈর্যকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا

অর্থাৎ পুত্র শোকে কাতর, বিপদের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুসা-জননীর সংজ্ঞা-লুপ্ত হবার আশংকা হয়েছিলো, কেননা তিনি শুনেছিলেন তাঁর নবজাত শিশু মুসা ফেরাউনের কাছে পৌঁছে গেছে। অধিকাংশ তফসীরকারকগণ এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, মুসার স্মরণ ব্যতীত তাঁর অন্তরে আর কিছুই ছিলোনা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তিনি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তুমি তোমার পুত্র সন্তানকে নীল নদে ফেলে দাও, এর জন্যে চিন্তিত হয়োনা, ভয় করোনা, আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। মুসা-জননী বিস্মৃত হয়েছিলেন একথাটি। আর শয়তান তখন তাঁকে একথা বলে, তুমি কি পছন্দ কর না যে ফেরাউন তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এবং তার সওয়াব তুমি পাবে, তাছাড়া তুমি নিজেই তো তাকে সাগরে ফেলে দিয়েছ যা গুনাহর কাজ হয়েছে, এখন যদি ফেরাউন তোমার সন্তানকে হত্যা করে, তবে তার বিনিময়ে তুমি সওয়াব পাবে।

যাহোক, মুসা-জননীর নিকট যখন এ সংবাদ আসে যে, তাঁর পুত্রকে ফেরাউনের নিকট পৌঁছানো হয়েছে, তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ

অবস্থা এত চরমে পৌঁছেছিল যে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেবেন এবং বলবেন, মুসা আমার পুত্র।

একরামা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন অবস্থা হয়েছিল যে মুসা-জননী বলে দিতেন, হায়! আমার পুত্র।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেন, এর অর্থ হলো যখন সিন্দুকটি নীল নদে ভাসিয়ে দেয়া হয়, আর নদীর ঢেউয়ে সিন্দুকটি একবার ওপরে, একবার নীচে চলে যাচ্ছিল, আর তা নিমজ্জিত হবার আশংকা দেখা দেয়, তখন মুসা-জননীর চিৎকার দেবার উপক্রম হয়েছিলো।

কালবী (রঃ) বলেছেন, মুসা (আঃ) যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁকে ফেরাউনের পুত্র বলে বেড়াত। তাঁর মাতা একথা শুনে ব্যথিত হতেন, তখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো যে তিনি বলে দেবেন মুসা আমার পুত্র।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যাংশের এ অর্থ করেছেন যে মুসা-জননীর মন সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর কোন দুশ্চিন্তা রয়নি, এ অবস্থা তখন হয়েছে,

যখন তিনি শ্রবণ করলেন যে, ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। একথা শ্রবণ করে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন, আনন্দের আতিশয্যে মুসা আমার পুত্র এ ঘোষণা করার উপক্রম হয়েছিলো।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম তফসীরকার সুদ্দী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুসার ভগ্নি ফেরাউনের লোকদের নিকট বললো যে আমি তোমাদেরকে এমন স্ত্রীলোকের সন্ধান দিতে পারি, যাঁর স্তন্য এ শিশুটি পান করবে, যখন তারা এজন্যে তাকে অনুরোধ করলো, তখন সে তার মাতাকে নিয়ে ফেরাউনের মহলে উপস্থিত হলো এবং মুসা-জননী শিশুটিকে কোলে নিয়ে যখন দুধ পান করাতে লাগলেন তখন সেই আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে 'এটি আমার সন্তান' কথাটি বের হবার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে এমন কথা বলা থেকে রক্ষা করলেন।

আবু ওবায়দা (রঃ) আয়াতের এ অর্থ করেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

لَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ

(তুমি ভয় করোনা এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়োনা।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতির উপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস এত সুদৃঢ় ছিল যে তিনি একথা প্রকাশ করে দেবেন যে মুসা আমার পুত্র এবং আল্লাহ পাক তাঁর হেফাযত করবেন, তাঁর মনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো।

لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا

যদি আমি তার অন্তরকে (আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাসী থাকার প্রতি অটল অবিচল না রাখতাম।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি তার অন্তরকে সুদৃঢ় না রাখতেন তবে সে চরম দুঃখে অথবা পরম আনন্দে একথা প্রকাশ করে দিত যা সে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জেনেছিল।

لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর তার অন্তর এজন্যে সুদৃঢ় করা হয়েছে যেন সে মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইউসুফ এবনে হোসাইন বলেছেন, মুসা-জননীকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দুটি আদেশ দেয়া হয়েছে, দু'টি কাজ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, আর দু'টি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর উপকার তিনি তখনই লাভ করেছেন যখন আল্লাহ পাক তার মনকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর মনের সকল দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করেছেন, আর তা এজন্যে করেছেন যেন তিনি মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হন। অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকে, তিনি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হন।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

সে মুসার ভগ্নিকে বললো, মুসার অনুসরণ কর তথা তার পেছন পেছন যাও এবং দূর থেকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখ, কেউ যেন বুঝতে না পারে, এভাবে আত্মগোপন করে লক্ষ্য রাখ সিন্দুকটি কোথায় যায়।

মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মুসার ভগ্নি মরিয়ম বিনতে ইমরান নদীর তীরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকে যে তার ভাই জীবিত আছে, নিরাপদে আছে, অবশেষে সে ফেরাউনের মহলে পৌঁছে যায় এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া তাঁকে কোলে নেন। শিশু মুসাকে নিয়ে সেখানে জল্পনা-কল্পনা হয়, শহরময় এ খবর ছড়িয়ে পড়ে, তাই বহু লোকের সমাগম হয়। অপরিচিতা এ মেয়েটির সঙ্গে ঐ শিশুর কোন সম্পর্ক আছে-এ সম্পর্কে কেউ কোন ধারণা করেনি।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ

(আমি পূর্বেই মুসাকে ধাত্রী স্তন্য পান থেকে বিরত রেখেছিলাম।)

অর্থাৎ শিশু মুসা কোন ধাত্রীর স্তন্য পান করবেন না, শুধু নিজের মায়ের স্তন্যই পান করবেন- এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বেই নিয়ে রেখেছিলাম। তাই ফেরাউনের রাজমহলে যখন তার লালন-পালনের জন্যে ধাত্রী আনা হয়, তখন মুসা কারো স্তনেই মুখ দিলেন না। এমনি অবস্থায় তারা দারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার একমাত্র আকাংক্ষা ছিল, শিশুটি কারো স্তন্য পান করুক। আর এ উদ্দেশে একের পর এক ধাত্রী হাযির করা হয়, কিন্তু শিশু মুসা কারো স্তনেই মুখ দিতে রাজি হলেন না এবং চিৎকার করে কাঁদতে থাকলেন, আর এভাবে আটটি রাত অতিবাহিত হয়। তখন শিশুটির দেখা-শোনায় নিয়োজিত লোকেরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাদের বিব্রতকর অবস্থা দেখে মুসার ভগ্নি মরিয়ম বিনতে ইমরান তার ভূমিকা পালন করলো।

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

তাই মুসার ভগ্নি বললো, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব যারা তোমাদের হয়ে তার লালন-পালন করবে এবং তার কল্যাণকামী হবে, তারা রাজকীয় পুরস্কার এবং সম্মানের আশায় তার কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করবে।

তফসীরকার এবনে জোরায়েয এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ এর অর্থ হলো, যে পরিবারের কথা আমি বলেছিলাম তারা রাজার কল্যাণকার্মী। তখন লোকেরা বললো, মনে হয় তুমি সেই পরিবার সম্পর্কে জান, বল তারা কে? সে বললো, আমি শুধু এতটুকু বলছি যে তারা রাজার কল্যাণকামী, তার পক্ষের লোক। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যখন মুসার ভগ্নি মরিয়মকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সে বলে আমি একথাটি রাজার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই বলছি। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যখন মুসার ভগ্নি ঐ প্রস্তাব পেশ করে, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, যে স্তন্য দান করবে সে কে? মরিয়ম বললো আমার মা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মায়ের কোন পুত্র সন্তান রয়েছে

কি? সে বললো হ্যাঁ, তার নাম হারুন (হযরত হারুন (আঃ) যে বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন সে বছর শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়নি)। লোকেরা বললো, তুমি ঠিক বলেছো, এখন তোমার মাকে নিয়ে আস। মরিয়ম তার মায়ের নিকট গমন করে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে এবং তাঁকে নিয়ে আসে। শিশু মুসাকে বুকে নেয়া মাত্রই তিনি ধাত্রীরূপী মুসা-জননীর দুধ পান করতে লাগলেন। এতে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু মুসা-জননী ফেরাউনের রাজমহলে থাকতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, আমার ঘর-সংসার আছে, যদি আপনার এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন তবে তাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে লালন-পালন করতে পারি, আমি কথা দিতে পারি যে তার আদর-যত্নে এতটুকু ত্রুটি করা হবেনা, এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অবশেষে তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, মুসা-জননীর শিশু মুসার লালন-পালনের জন্যে সরকারী কোষাগার থেকে দৈনিক একটি দিনার প্রদান করা হয়, তিনি তা গ্রহণ করেন। এভাবে মুসা-জননীকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ "শিশু সন্তানটিকে নদী বক্ষে ফেলে দাও, আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব"। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"এভাবেই আমি ফিরিয়ে দিলাম তাকে তার মায়ের কাছে, যাতে তার নয়ন জুড়ায়, সে দুঃখিত না হয় এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে আল্লাহ পাকের কথা চির সত্য, কিন্তু অনেকেই তা জানেনা"।

মুসা-জননী স্বচক্ষে দেখলেন যে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

অর্থাৎ যাতে করে মুসা-জননীর নয়ন জুড়ায় আর মুসার বিরহে সে ব্যথিত, মর্মাহত এবং দুঃখিত না হয়, আর এ সম্পর্কে অবগত হয় যে আল্লাহ পাকের ওয়াদা চির সত্য।

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"কিন্তু অনেকেই তা জানে না"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি যে চির সত্য এবং কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না, একথা সকলে জানে না, আর এ কারণেই মানুষ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিষিদ্ধ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেনা। আর যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস করেনা, সেহেতু নেক আমল করার ব্যাপারে অবহেলা করে।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের لَا يَعْلَمُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,

এর অর্থ হলো ফেরাউনের লোকেরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস করতো না এবং তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কেও কিছুই জানত না, আর একথাও জানত না, যে খবর দিল সে ছিল তার ভগ্নি এবং যিনি স্তন্য দান করেছেন তিনি ছিলেন তাঁর মাতা।

যাহোক, শিশু মুসা যতদিন দুধ পান করেছেন ততদিন মায়ের কাছেই ছিলেন। এরপর তিনি তাঁকে ফেরাউনের রাজমহলে ফিরিয়ে দেন। যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক কিভাবে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন তা অধিকাংশ লোক জানে না। আল্লাহ্ পাক এভাবে মুসা-জননীর দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের সমস্যার সমাধান করেছেন। আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন দুশমনদের দ্বারাও তাঁর আপন বন্দাদের উপকৃত করেন।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো যেহেতু তারা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি লক্ষ্য করেনা, তাই তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

দ্বিতীয়তঃ তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মিসরবাসী জানত না যে আল্লাহ্ পাক মুসা (আঃ)-কে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ লোক জানত না একথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাক মুসা (আঃ)-কে মজলুমের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্যে, জালেমদের মূলোৎপাটনের জন্যে এবং দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রেরণ করেছেন, এতে যে দ্বীনি উদ্দেশ্য ছিল তা তারা জানত না।[৩]

নামকরণঃ

বর্ণিত আছে, লোকেরা আছিয়াকে বললো, এই প্রিয়দর্শন শিশুটির একটি নাম রাখা হোক, আছিয়া বললো, আমি তার নামকরণ করেছি মুসা, কেননা আমরা তাকে পানি এবং বৃক্ষের মাঝে পেয়েছি। 'মু' অর্থ পানি, আর 'সা' অর্থ বৃক্ষ।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ৯১-৯৫
২। তফসীরে আদ্দুরুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৩০
৩। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃঃ ২০-২৭

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ
أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا
مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

তরজমা

(১৪) যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করি, এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(১৫) সে এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করে যখন সেখানে নগরবাসীরা ছিল বে-খবর এবং দুটি লোককে সেখানে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখে, একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন শত্রুপক্ষের, তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন মুসা তাকে একটি ঘুসি মারে। এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসে, মুসা বলে এটি শয়তানের কান্ড, সে তো প্রকাশ্য শত্রু এবং পথভ্রষ্টকারী।

(১৬) মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। এরপর আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৭) মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেমন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তেমনি আমিও কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্ম, তাঁর নিরাপত্তার অদৃশ্য-ব্যবস্থাপনা এবং দুশমনের গৃহে তাঁর লালন-পালনের উল্লেখ করা হয়েছিলো, আর

এ আয়াতে তাঁর যৌবনের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا

"আর মুসা (আঃ) যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আল্লাহ পাক তাকে হেকমত ও এলম দান করলেন"।

মানুষ পূর্ণ যৌবন-প্রাপ্ত বা পরিণত বয়স্ক কখন হয় এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। তফরীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এটি হলো আঠারো থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স। অন্যদিকে তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, পূর্ণ যৌবনে উপনীত হতে তেত্রিশ বছর বয়স হওয়া জরুরী। সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছার অর্থ হলো চল্লিশ বছর বয়স হওয়া। এলম এবং হেকমত তথা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত এবং তাঁর বিধি-নিষেধের এলম তাঁকে দান করা হয়েছে, এর অর্থ নবুওয়্যত নয়, কেননা নবুওয়্যত মাদয়ান থেকে মিসর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে দান করা হয়েছিল।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

"আর আমি এভাবেই নেককার লোকদের প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ পাকের নির্দেশে নীল নদে ফেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন, আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ "আমি এভাবেই নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا

(সে এমন সময় নগরীতে প্রবেশ করে যখন নগরবাসীরা ছিল বে-খবর।)

হযরত মুসা (আঃ)-এর যৌবনের একটি ঘটনা

হযরত মুসা (আঃ) যখন পরিণত বয়স্ক হলেন তখন তিনি একটি শহরে প্রবেশ করেন। এটি কোন্ শহর ছিল এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এটি ছিল মাদয়ান শহর যা মিসর সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'মদীনা' শব্দটি দ্বারা মিসরের উপকণ্ঠে অবস্থিত খানাইন এলাকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা মিসর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা 'মদনীয়াতুস শামস' উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (রঃ) বলেছেন, এটি ছিলো মনাফ নামক শহর।

হযরত মুসা (আঃ) অনেকদিন পর এ শহরে গমন করেছিলেন।

আলোচ্য আয়াতের حِيْنِ غَفْلَةٍ শব্দ দ্বারা দ্বিপ্রহরের সময়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যখন লোকেরা সাধারণতঃ বিশ্রামরত থাকে।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) বলেছেন, এটি ছিল মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়।

ঘটনার বিবরণ এই, হযরত মুসা (আঃ)-কে সাধারণতঃ ফেরাউনের পুত্র বলা হতো, তাঁর যানবাহন ফেরাউনের যানবাহনের ন্যায় হতো। আর তাঁর পোশাকও ফেরাউনের ন্যায়ই রাজকীয় হতো। একদিন ফেরাউন কোথাও বেরিয়ে পড়ে, হযরত মুসা (আঃ) তখন উপস্থিত হন, সময় ছিলো দ্বিপ্রহর, পথে জন-মানুষের উপস্থিতি তেমন ছিলো না, সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে বিশ্রামরত ছিলো।

মোহাম্মদ এবনে এছহাক বলেছেন, বণী ইসরাঈলে হযরত মুসা (আঃ)-এর কিছু অনুসারী ছিল। তারা তাঁর অনুসরণ করতো এবং তিনি যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন তা তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছিলো। এতদ্ব্যতীত, তাঁর বয়ঃবৃদ্ধির পাশাপাশি তিনি একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন, তা হলো তাঁর স্বজাতি বণী ইসরাঈলের প্রতি ফেরাউন ও তার জাতির নিষ্ঠুর ব্যবহার। তিনি বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করতেন। মজলুম বণী ইসরাঈলের প্রতি তিনি সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন। এ কারণে বণী ইসরাঈলীরা প্রায়শঃ তাঁর নিকট আসত এবং তাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতো। তিনি শহরতলীতে অবস্থিত তাঁর মাতৃগৃহেও কখনো অবস্থান করতেন। আর কখনো ফেরাউনের রাজমহলেও থাকতেন। যেদিন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় আলোচ্য শহরটিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখতে পান একজন ইসরাঈলী এবং একজন কিবতীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, এমনি অবস্থায় বণী ইসরাঈলের ঐ ব্যক্তি কিবতী লোকটির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশে একটি ঘুষি মারেন। ঘটনাচক্রে হযরত মুসা (আঃ)-এর ঐ এক ঘুষিতেই কিবতী লোকটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। অথচ এ অবস্থা হযরত মুসা (আঃ)-এর কাম্য ছিলো না। তিনি আদৌ তাকে হত্যা করতে চাননি, তিনি শুধু চেয়েছিলেন জালেমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখতে এবং একটি ঘুষি দিয়ে তাকে মজলুম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। পরবর্তী আয়াতে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছেঃ

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ

এবং তিনি দুটি লোককে সেখানে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখেন। একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন তার শত্রু পক্ষের। অর্থাৎ একজন বণী ইসরাঈলী এবং অন্যজন কিবতী।

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ

"তার সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে"।

ইসরাঈলী ব্যক্তিকে কিবতী লোকটি জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, কিবতী লোকটি ছিলো ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীর সদস্য। হযরত মুসা (আঃ) তাকে বললেন, তুমি এ

ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও, সে বললো, আমি তো একে নিয়ে যেতে চাই এজন্যে যে সে আপনার পিতার (ফেরাউনের) বাবুর্চি খানায় জ্বালানী সংগ্রহ করে পৌঁছে দেয়, অর্থাৎ ঐ সৈন্যটি তাকে বেগার খাটানেরা জন্যে বাধ্য করতে চেয়েছিলো, হযরত মুসা (আঃ) তাকে বাধা দেন, ঐ সৈন্যটি তখন বললো, আমি তো এখন ইচ্ছা করছি যে জ্বালানীগুলো তোমার মাথায় তুলে দেব। হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দীর্ঘদেহী। তিনি কিবতীর ঐ বেআদবীপূর্ণ কথার পর তাকে একটি ঘুষি মারলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্যে হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হন। আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করেন। হযরত মুসা (আঃ) এ ঘটনাকে অত্যন্ত মন্দ ও শয়তানী কাজ বলে আখ্যা দেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ

(এটি শয়তানের কান্ড, সে তো প্রকাশ্য শত্রু এবং পথভ্রষ্টকারী।)

হযরত মুসা (আঃ) এ কাজকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা তখনও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ হয়নি, আর তিনি তাদের মাঝেই নিরাপদ ছিলেন। এমনি অবস্থায় হঠাৎ কোন কাফেরকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে জায়েয ছিল না, তবে এ হত্যাকান্ড তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিলো না, বরং ভুলক্রমে হয়েছিলো, এজন্যে এ কাজকে "নবী রসূলগণ নিঃস্পাপ হন" কথাটির পরিপন্থী বলা যায়না, আর মুসা (আঃ) নিজেই একে অন্যায় এবং শয়তানী কাজ বলে মনে করেছেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"মুসা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। এরপর আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে ক্ষমা করলেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা নেই।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর হক্ব মাফ করে দিয়েছেন, আর যেহেতু সে কাফের এবং জালেম ছিল, তাই তার হত্যার কারণে কেসাস বা দিয়ত ওয়াজিব হয়না, এজন্যে তার উত্তরাধিকারীদের থেকে ক্ষমা গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন পড়েনা।

হযরত মুসা (আঃ) আরো বলেছেনঃ

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

"মুসা বললো, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেমন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ,

তেমনি আমিও (সংকল্প করেছি), ভবিষ্যতে কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবোনা"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের المجرمين শব্দটির অর্থ الكٰفرين এর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তিকে হযরত মুসা (আঃ) সাহায্য করেছিলেন, সে বণী ইসরাঈলী কাফের ছিলো, তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ মতই পোষণ করেছিলেন। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি ভবিষ্যতে আর কখনো কোন অপরাধীকে সাহায্য করবো না। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো, এরপর আমি আর কোন লোককে এমন সাহায্য করবোনা যা আমাকে অপরাধীর পর্যায়ে নিয়ে যায়।[১]

আলোচ ঘটনা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) কখনো একথা চিন্তা করেননি যে তাঁর মাত্র একটি ঘুষিই ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর চাল-চলন, উন্নত আদর্শ যারা দেখেছে, তারা কখনো চিন্তা করেনি যে তাঁর দ্বারা হত্যাকান্ড হয়ে যাবে। আর কখনো তিনি তার ইচ্ছাও করেননি। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তেজনা হেতু কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আর বাড়াবাড়ি মাত্রই শয়তানের কাজ। যারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য–ধন্য তারা কখনো এমন কাজে নিজেকে শরীক করেন না, এটি তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সত্য উপলব্ধি করেই হযরত মুসা (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করেন।

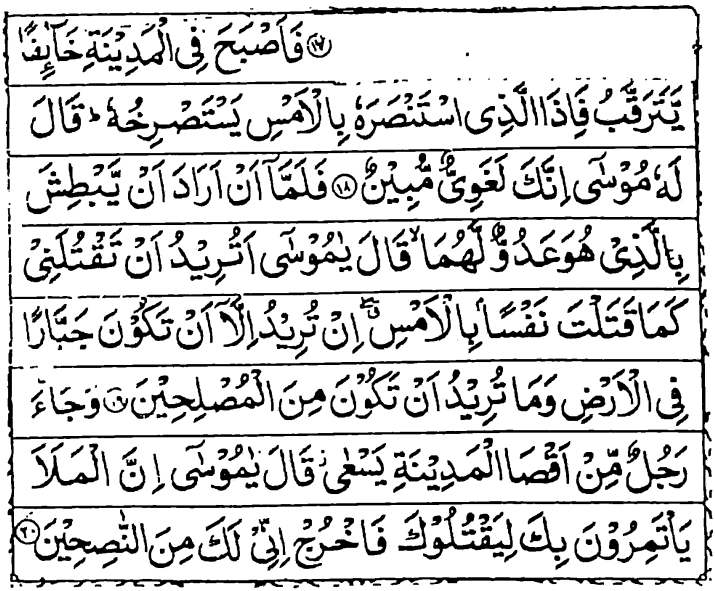
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا ﴿١٨﴾
يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ
لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَ
رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১০২-০৩
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৪, পৃঃ ২৩৩-৩৪

তরজমা

(১৮) এরপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে রাত্রি প্রভাত করে। ঘটনাক্রমে দেখে কাল যে লোকটি তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলো সে পুনরায় তার নিকট সাহায্যের জন্যে ফরিয়াদ করছে। মুসা তাকে বলে, নিশ্চয় তুমি নিজেই যতসব নষ্টের মূল কারণ।

(১৯) এরপর মুসা যখন উভয়ের শত্রুর প্রতি হাত তুলতে ইচ্ছা করে তখন সে ব্যক্তি বলে উঠলো, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও। শান্তি স্থাপনকারী হতে চাওনা।

(২০) নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মুসা! রাজ দরবারের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, অতএব তুমি নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার কল্যাণকামী।

তফসীরুল কোরআন

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

কিবতী হত্যার ঘটনার পর হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিশোধ নিতে পারে, এ আশংকা অতি স্বাভাবিক। বর্ণিত আছে যে ফেরাউনের নিকট নিহত কিবতীর উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলো। এমনি অবস্থায় তাঁর ভীত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট অনেক লোক হাযির হয় এবং বলে, বণী ইসরাঈলীরা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে, আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ফেরাউন বললো, ঘাতকের অনুসন্ধান কর এবং হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ কর, এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। লোকেরা তখন ঘাতকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল।

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

এমনি অবস্থায় পরদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে। তিনি দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেক কিবতীর সঙ্গে লড়াই রত রয়েছে এবং গতকালের ন্যায় আজও সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য কামনা করলো।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

মুসা (আঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমিই সকল নষ্টের মূল, তা না হলে প্রতিদিন শুধু তোমার সঙ্গেই কেন মানুষের ঝগড়া হয়?

মুসা (আঃ) গতকালের ঘটনায় নিজেই লজ্জিত-অনুতপ্ত ছিলেন, কেননা তাঁর অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাঁর হাতে একজন কিবতী নিহত হয়েছে। আর ঐ হত্যাকান্ডের মূল কারণ ছিল এ বণী ইসরাঈলী ব্যক্তিটি, আজ সে পুনরায় অপর এক কিবতীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে, তাই মুসা (আঃ) তাকে বললেন,

إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট, তুমিই সকল নষ্টের মূল কারণ। একথা বলে যখন তিনি অত্যাচারী কিবতীকে প্রহার করার জন্যে হাত তুলতে ইচ্ছা করেন তখন

قَالَ يٰمُوسٰى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْأَمْسِ

ইসরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করছিল, তিনি ধমক যখন আমাকে দিয়েছেন, হয়তো আমাকেই তিনি প্রহার করতে চান, তাই সে বললো, হে মুসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান? যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, আপনি দেখি দেশের মধ্যে বল প্রয়োগ তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে চান, আপনি শান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী নন। ইসরাঈলী ব্যক্তিটি একথা বলে গতকালের ঘটনা প্রকাশ করে দেয় এবং গতকালের ঘাতকের সন্ধান দিয়ে দেয়। অথচ হযরত মুসা (আঃ) চেয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে এবং জালেম কিবতীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে, কিন্তু সে ভুল বুঝে এ মন্তব্য করে বসে, এরপর যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে মুসা (আঃ)-এর হাতেই কিবতীর নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে। দাবানলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ফেরাউনের গোচরীভূত হয়। এদিকে ফেরাউনের পারিষদবর্গ ফেরাউনকে এ পরামর্শ দেয় যে, মুসার দুঃসাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে এবং সে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এমনকি আজ রাজার জাতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে এবং তাদেরকে হত্যা করতেও তার বাধেনি, অতএব তার কঠোর শাস্তি তথা মৃত্যুদন্ড একান্ত জরুরী। ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তাঁকে ধরে আনার জন্যে বাহিনীও প্রেরিত হয়। এদিকে ফেরাউনের দরবারেই এক ব্যক্তির অন্তর হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি সহমর্মিতায় এবং তাঁর কল্যাণ কামনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, সে অনতিবিলম্বে সকলের অলক্ষে ছুটে আসে এবং মুসা (আঃ)-কে অতি সত্ত্বর শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তফসীরকারগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন হাজঈল। ফেরাউনের জাতির মধ্যে এ ব্যক্তি ছিলো মোমেন। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামউন। আর কেউ বলেছেন সামআ। তাঁর অন্তরে হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্যে ছিল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি এবং মহব্বত, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعٰى

নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মুসা! রাজার পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, তুমি (এ মুহূর্তে) নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে আমি তোমার একান্ত কল্যাণকামী। আর এজন্যেই আমি তোমাকে সতর্ক করার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

বর্ণিত আছে যে হযরত মুসা (আঃ) ঐ ব্যক্তির পরামর্শ মোতাবেক অনতিবিলম্বে মিসর ছেড়ে যান। তিনি তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আর এ আশংকা করছিলেন যে ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তিটি হযরত মুসা (আঃ)-কে সতর্ক করার জন্যে এসেছিলো, তাঁর নাম ছিল হিজকীল, আর কেউ বলেছেন, শামউন এবনে এছহাক। আর তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই। এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করেন।[২]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ফেরাউনের লোকেরা যখন হযরত মুসা (আঃ)–এর পিছু ধাওয়া করলো, এ ব্যক্তিও হয়তো কিছুটা আগে ঐ একই পরামর্শ সভা থেকে বের হয়ে আসে, তারা মুসা (আঃ)-কে পেলোনা, অথচ তিনি কি করে পেলেন?

ইমাম তাবারী (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় দিন যে কিবতী লোকটির সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তির সংঘর্ষ চলছিলো, যখন সে ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে একথা শ্রবণ করে, 'হে মুসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছো'? তখনই সে দ্রুতবেগে ফেরাউনের দরবারে এসে বললো, গতকালের ঘাতকের সন্ধান পেয়েছি, সে হলো মুসা। তখন ফেরাউন তার জল্লাদদেরকে মুসা (আঃ)-কে হত্যা করতে প্রেরণ করলো, তারা রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হলো, তারা নিশ্চিত ছিলো যে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করতে পারবে।

কিন্তু হযরত মুসা (আঃ)-এর হিতাকাংক্ষী ঐ ব্যক্তি রাজপথ দিয়ে নয়, বরং ছোট ছোট গলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাদের পূর্বেই মুসা (আঃ)-কে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যান।[৩]

ইনশাআল্লাহ্ না বলার কারণে-

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রথম দিনের হত্যাকান্ডের ঘটনার পর হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ পারেক দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ পাক ক্ষমাও করেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলেনঃ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

"হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু তুমি আমাকে নেয়ামত দান করেছ, তাই আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না"।

এ শপথের সময় হযরত মুসা (আঃ) 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, আর এ কারণেই পরদিন সকালে তিনি পুনরায় একই বিপদে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সংকল্পে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১০৪-০৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ৫৮
৩। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ৩৩

স্থির থাকতে পারেননি।[৪]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ আলোচ্য ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে হযরত মুসা (আঃ)–কে ফেরাউনের জল্লাদরা হত্যা করতে চেয়েছিলো, ঠিক তেমনি মক্কার দূরাত্মা কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও হত্যা করার অপচেষ্টা করবে। আর যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মুসা (আঃ)-কে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনী ষড়যন্ত্রগুলোকে বানচাল করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি মক্কার কাফেরদের সকল চক্রান্তকেও তিনি নস্যাৎ করে দেবেন। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও হেফাযত করবেন। আর অবশেষে তাই হয়েছিল।

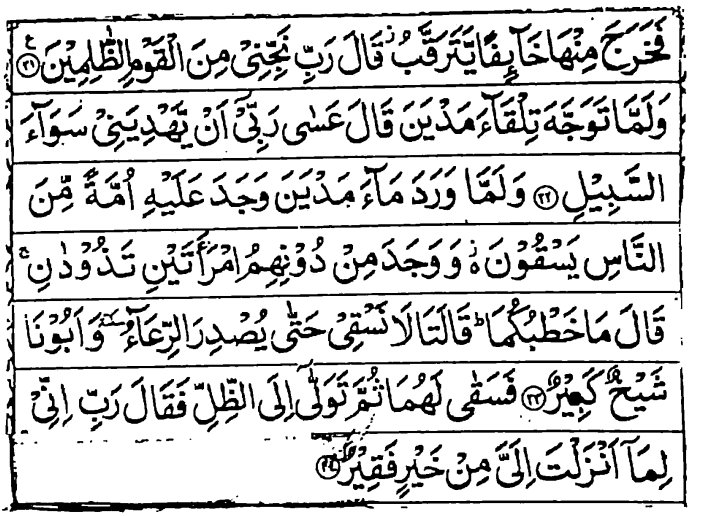

তরজমা

(২১) এরপর মুসা (আঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেখান থেকে পথ দেখতে দেখতে বের হয়ে পড়ে, সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।

(২২) এবং মুসা যখন মাদয়ানের দিকে রওয়ানা হয়, তখন সে বলে, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

(২৩) আর যখন সে মাদয়ানের কূপের নিকট হাযির হয়, সেখানে একদল লোককে তিনি দেখতে পান তারা (তাদের জন্তুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে দু'টি নারী বাধা প্রাপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, তোমাদের কি অবস্থা? তারা বলে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৫

রাখালরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারছি না, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, তাঁর বয়স হয়েছে অনেক।

(২৪) সে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দেয়, এরপর ছায়াতলে সরে আসে এবং (আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করে) বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে উত্তম জিনিস আমার প্রতি নাজিল কর, আমি তার মুখাপেক্ষী রয়েছি।

তফসীরুল কোরআন

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ

কিবতী হত্যা এবং পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় হযরত মুসা (আঃ) মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং মাদয়ানের দিকে অগ্রসর হন। অজানা পথ, দূরবর্তী মঞ্জিল, দুশমনের ভয় প্রতি পদক্ষেপে, কিন্তু এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেই তিনি অগ্রসর হলেন অজানা গন্তব্যের পানে। আলোচ্য আয়াতের خائفশব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকেও ভয় করতে পারেন, তবে এ ভয় হলো স্বভাবগত। আর স্বভাবগত ভীতি নবুওয়্যতের শানের পরিপন্থী নয়। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের শান সম্পর্কে যে এরশাদ হয়েছে "আল্লাহ ব্যতীত তাঁরা আর কাউকে ভয় করেন না"-এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের প্রচার-প্রসারে তাঁরা ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না। আলোচ্য আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর যে ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁর স্বভাবগত ভয়, কেননা ফেরাউনের জল্লাদ বাহিনী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

হযরত মুসা (আঃ) ঐ ব্যক্তির খবর পেয়ে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? কোন্ দিকে যাবেন? কোন্ পথে যাবেন? তা তো তিনি জানেন না। তাই ঐ মুহূর্তে তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাফেরদের জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং সরল সঠিক পথ লাভের জন্যে মোনাজাত করলেন।

قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

সে বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার! জালেম সম্প্রদায়ের জুলুম থেকে আমাকে রক্ষা কর, আমি যেন তাদের নাগালের বাইরে চলে যাই, তার তৌফিক দান কর।

বর্ণিত আছে, ফেরাউন যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার খবর পেল, তখন সে তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাহিনীর একটি দল বের হয়ে পড়ে।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ

আর যখন সে মাদয়ানের দিকে রওয়ানা হয় তখন বলে, আমি আশা করি যে আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

ফেরেশতা হলো পথ-প্রদর্শক

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর দেশ মাদয়ানের দিকে যাওয়ার তৌফিক দিলেন। এ মাদয়ান শহরটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত মাদয়ানের নামে আবাদ করা হয়। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা নিয়ে বের হয়েছিলেন। যখন তিনি একথা বললেন, 'হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন' তখন একজন ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট বর্শা ছিল। তিনি পথ দেখিয়ে অগ্রসর হলেন সম্মুখের দিকে।

হযরত মুসা (আঃ) যখন মিসর থেকে বের হন তখন তাঁর কাছে কোন যানবাহন ছিল না এবং পানাহারের কোন বস্তুও ছিল না। অথচ তাঁকে যেতে হবে ফেরাউনের রাজত্বের সীমানা পেরিয়ে। তাঁকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয় ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। তাঁর পায়ের আঙ্গুলের নখগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রথম পরীক্ষা।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, মাদয়ান সেই শহর যেখানে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বাস করতেন।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিলো যে, মুসা (আঃ)-এর একজন হিতাকাংখী এ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আপনি এ মুহূর্তে মিসর থেকে বেরিয়ে যান। মুসা (আঃ) তখন আল্লাহ পাকের কাছে এ দোয়া করলেনঃ

رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

"হে পরওয়ারদেগার! জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে উদ্ধার করুন"।

আল্লাহ পাক তাঁর এ দোয়া কবুল করলেন এবং জালেমদের হাত থেকে নাজাত লাভের একটা ব্যবস্থা করলেন। তিনি মিসর থেকে বের হয়ে পড়লেন অজানা পথে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে যেদিকে পারলেন সেদিকেই রওয়ানা হয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ পাকের নির্দেশে মাদয়ানের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত মুসা (আঃ) যখন মিসর থেকে রওয়ানা হলেন, তখন মাদয়ানে গমনের কোন ইচ্ছা করেননি, বরং নিজেকে আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করে চলতে শুরু করেন, আল্লাহ পাকই তাঁকে মাদয়ানে পৌঁছে দেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) মাদয়ানের উদ্দেশেই বের হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পথ চিনতেন না, তাই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে রওয়ানা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১০৬

হয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাক তাঁকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দিয়েছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, জীব্রাঈল (আঃ) এসে তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেছেন।

এবনে জরীর এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) যখন মিসর থেকে রওয়ানা হন, তখনই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একজন ফেরেশতা উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনি আমার অনুসরণ করুন, এভাবে হযরত মুসা (আঃ) মাদয়ানে পৌঁছেন।[১]

আল্লাহ পাক তাঁর আশা পূর্ণ করলেন এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই সরল পথ দেখালেন এবং সে পথে পরিচালিত করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিলেন।

হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়া ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ন্যায়। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্বদেশ পরিত্যাগ করার সময় বলেছিলেনঃ

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

"আমি আমার প্রতিপালকের দিকে রওয়ানা হয়েছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন"।

মোটকথা, মুসা (আঃ) মিসর থেকে রওয়ানা হলেন, মুখ ছিল মাদয়ানের দিকে আর অন্তর ছিল আল্লাহ পাকের দিকে।

وَلَمَّا وَرَدَ . . . .

মুসা (আঃ) যখন ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাদয়ান শহরের একটি কূপের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে তিনি লোকের ভীড় দেখতে পেলেন। লোকেরা সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে তাদের গৃহপালিত পশুদেরকে পান করাচ্ছে। সেখান থেকে সামান্য দূরে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন। তারা তাদের বকরীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছিল যেন তাদের বকরী অন্যদের বকরীর সাথে মিশে না যায়। এ দু'জন স্ত্রীলোক ছিলেন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যা। লজ্জায় তারা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের এমন শক্তি ছিলোনা যে পুরুষদের ভীড় মোকাবেলা করে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। তাদের এ অসহায় অবস্থা দেখে মুসা (আঃ)-এর পরোপকার প্রবণ অন্তরে দয়া হলো।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

"তিনি বললেন, 'তোমাদের কী হয়েছে'? তারা বললো, 'যতক্ষণ না এই রাখালরা তাদের জন্তুদের জন্যে পানি সংগ্রহ করে সরে পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারছি না"।

কারণ আমরা এ ভীড়ের ভেতরে যাওয়া পছন্দ করি না, আমরা বাধ্য হয়েই এখানে এসেছি, আমাদের পিতা ব্যতীত আর কেউ নেই, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তিনি বাড়ী থেকে বের হতে পারেন না। কোন উপায় না থাকায় আমাদেরকে এখানে আসতে হয়েছে, আর আমরা উভয়ই দুর্বল। তাই তাদের ফিরে যাওয়ার পর আমাদের বকরীকে পানি পান করাতে পারবো। মুসা (আঃ) যখন তাদের এসব কথা শুনলেন তখন তাদের জন্যে তাঁর সহানুভূতি

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৪, পৃঃ ২৩৮

হলো।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ

মূসা (আঃ) (পানি সংগ্রহ করে) তাদের (দুজনের বকরী)-কে পান করালেন। এরপর সেখান থেকে সরে ছায়ায় গিয়ে বসলেন। মহিলাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেন না। এক আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এই দোয়া করলেনঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি যা কিছু নেয়ামত, রিয্ক, বরকত তথা কল্যাণ দান করেন আমি তার মুখাপেক্ষী। আমি একজন ফকীর মাত্র আর আপনি মহান দয়াবান দাতা। আমি আপনার সম্মুখেই রয়েছি। গায়বী ভান্ডার থেকে যা কিছু পাওয়া যায় আমি অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ পাক গায়ব থেকেই তাঁর জন্যে ব্যবস্থা করলেন।

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

"আর আমাদের পিতা বৃদ্ধ"।

ঐ দু' নারী তাদের অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে ভীড়ের কারণে আমরা কূপ থেকে পানি ওঠাতে পারিনা, আর আমাদের পিতা বৃদ্ধ।

এ বৃদ্ধ পিতা কে? এর জবাবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)। আর ওহাব এবং সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো শেরুন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন মর্দে মোমেন, যিনি হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

فَسَقٰى لَهُمَا

(এরপর মুসা (আঃ) তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) সমবেত লোকদেরকে সরিয়ে কূপের কাছে পৌঁছেন এবং তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ঐ কুপের পার্শ্বে আরেকটি কূপও ছিল, যার উপর একটি বড় পাথরের ঢাকনা ছিল, যা কমপক্ষে দশজন লোক সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরাতে পারত, অথচ হযরত মুসা (আঃ) একাই ঐ পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং বকরীগুলোর পানি পানের ব্যবস্থা করলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত মুসা (আঃ) শুধু এক বালতি পানি তুলেছেন এবং তাতে বরকতের দোয়া করেছিলেন, ফলে ঐ এক বালতি পানিতে বকরীগুলো তৃপ্তি লাভ করে।[১]

মানবতার উৎকর্ষ সাধনের নিদর্শন

এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, প্রথমত হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন নিজেই ক্লান্ত,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১০৬

শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত, কিন্তু নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপেক্ষা করেই পরোপকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এর চেয়ে উত্তম নিদর্শন আর কি হতে পারে!

দ্বিতীয়তঃ আরেকটি বিষয়ও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যদিও হযরত মুসা (আঃ) তখনও নবুওয়্যত লাভ করেননি, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এলমে নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত রয়েছেন। জালেমের জুলুমের ভয়ে তিনি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন, অজানা পথ পাড়ি দিয়ে আগমন করেছেন এক নূতন দেশ ও পরিবেশে। আল্লাহ্ পাক তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়েছেন যেখানে তাঁর পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনের কথা পূর্বেই স্থির রেখেছিলেন এবং যে নারীদ্বয়কে তিনি সাহায্য করলেন, তাঁরাও আরো একজন নবী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এরই কন্যা ছিলেন।

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ

এরপর তিনি (একটি বৃক্ষের) ছায়াতলে সরে আসলেন, অর্থাৎ তখন গরম ছিলো অত্যধিক, তাই তিনি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বসলেন, যেহেতু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি পরীক্ষা চলছিলো, কঠিন ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাঁকে আসতে হয়েছিলো এখানে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাতর। তাই আল্লাহ্ পাকের দরবারেই তিনি কষ্টের কথা উল্লেখ করে এভাবে ফরিয়াদ করেছিলেনঃ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে কোন নেয়ামত আমার প্রতি নাজিল কর, আমি তার জন্যে অত্যন্ত বেশী মুখাপেক্ষী রয়েছি। হে পরওয়ারদেগার! তুমি মহান দাতা, আমি তোমার দানের ভিখারী, আমি তোমার দরবারেই তোমার দানের জন্যে আরজী পেশ করছি। এভাবে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে রিয্কের জন্যে দোয়া করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে যারা কামেল, তারা তাদের সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে ফরিয়াদ করেন।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) তাঁর নিতান্ত প্রয়োজনে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সামান্য রিয্কই চেয়েছিলেন।

মর্মে কামেলের বৈশিষ্ট্য

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষ যত উচ্চ মর্যাদায়ই আসীন হোক না কেন, তার প্রকৃত পরিচয় হলো সে আল্লাহর বন্দা, আর বন্দা মাত্রই আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের ভিখারী, যেমন হযরত মুসা (আঃ) রোদের সময় ছায়ার মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন, এমনি ভাবে ক্ষুধার সময় খাদ্যের মোহতাজ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন বন্দার নিকট

তাঁর প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সামান্য খাদ্যের জন্যে আরজী পেশ করেছেন। কামেল বন্দার এটিই বেশিষ্ট্য।[১]

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে খায়ের বা কল্যাণের জন্যে আরজী পেশ করেছেন, এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দ্বীন এবং হেকমত দান করেছ, এজন্যে আমি তোমার দরবারে চির কৃতজ্ঞ, আমি তোমার দুয়ারের চির কাঙ্গাল, আমাকে রিয্ক দান কর, যেহেতু আমি ফেরাউনের অন্যায়-অনাচারের বিরোধিতা করেছি, তাই আমি নিঃস্ব, হৃত-সর্বস্ব। এমনি অবস্থায় আমি তোমার দানের ভিখারী, আমাকে দান কর তোমার নেয়ামত।[২]

فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى
اسْتِحْيَآءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ
فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ
مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ
اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৫) এরপর নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত পদে তার নিকট আসলো এবং বললো, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্যে, এরপর মুসা যখন তার নিকট উপস্থিত হয় এবং তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তখন সে বললো, "ভয় করোনা, ঐ দুর্বৃত্ত জাতির কবল থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছ"।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৭৮৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১০৯

(২৬) নারীদ্বয়ের একজন বললো, হে আব্বাজান! আপনি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন, কেননা আপনার কর্মচারী হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

(২৭) সে (শোয়ায়েব (আঃ) মুসা (আঃ)-কে) বললো, আমি আমার দু'টি কন্যার একটিকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি এ শর্তে যে তুমি আট বছর যাবত আমার কাজ করবে (এটিই বিবাহের দেন মোহর)। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর তবে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

(২৮) মুসা বললো, আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল, এ দু'টি মেয়াদের যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ পাক তার সাক্ষী।

তফসীরুল কোরআন

এদিকে হযরত মুসা (আঃ) বৃক্ষ ছায়াতলে বসে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করছিলেন, অন্যদিকে আল্লাহ পাক তাঁর জন্যে ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যাদ্বয় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কি করে আসলে? তখন তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করলেন যে একজন পথিক মুসাফির, অতি ভদ্র এবং শক্তিশালী ব্যক্তিকে সেখানে পেলাম, বকরীগুলোকে পানি পান করানোর ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন বলেই এত অল্প সময়ে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে, তারা একথাও বললেন যে, আপনার খেদমতের জন্যে এবং বাড়ীর বিভিন্ন কাজের জন্যে একজন লোকের তো একান্ত প্রয়োজন, এ ব্যক্তিকে এ উদ্দেশে রেখে দিন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) কন্যাদ্বয়ের মুখে এসব কথা শুনে বললেন, তাকে আমার নিকট ডেকে আন। তখন তাদের একজন লজ্জা জড়িত পদে হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট আসে এবং তাঁর পিতার কথা বলে।

মুসা (আঃ) একজন বৃদ্ধ বুজুর্গের দাওয়াতকে বরকতময় মনে করে কবুল করলেন এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। চলার সময় তিনি মেয়েটিকে বললেন, আমি আগে আগে চলতে থাকব, তুমি আমার পেছনে আসবে। হযরত মুসা (আঃ) এ পন্থা এজন্যে অবলম্বন করলেন যে পর নারীর প্রতি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নজর না পড়ে, এ মহান উদ্দেশেই এ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অবশেষে তাঁরা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি সান্ধ্যকালীন খাবার গ্রহণ করছিলেন। শোয়ায়েব (আঃ) মুসা (আঃ)-কে বললেন, এস, খাবার গ্রহণ কর। মুসা (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করছি। শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, তুমি কি ক্ষুধার্ত নও? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ক্ষুধার্ত, তবে আমার ভয় হচ্ছে, যে জন্তুগুলোকে আমি পানি পান করিয়েছি তার জন্যে কোন পারিশ্রমিক যেন আমি গ্রহণ না করি, কেননা আমি এমন বংশের লোক, যারা আখেরাতের জন্যে কৃত আমলকে সারা পৃথিবীর বিনিময়েও বিক্রয় করতে রাজী নয়। শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, ব্যাপার তা নয়, আল্লাহর শপথ! আমার পিতা, পিতামহ সকলের বৈশিষ্ট্য ছিল মেহমানদারী, আর এজন্যে আমরা

সকল মেহমানের মেহমানদারী করি।[১]

যাহোক, একথা শ্রবণ করে হযরত মুসা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সঙ্গে বসলেন এবং আহার করলেন, এরপর নিজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ

"এরপর মুসা যখন উপস্থিত হয় এবং তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তখন সে বললোঃ "ভয় করোনা, ঐ দুবৃত্ত জাতির কবল থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছ"।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে হযরত মুসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ এখন আর ভয় নেই, আল্লাহর রহমতে জালেমদের কবল থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছ, ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত এ দেশে তারা তোমার কোন ক্ষতি করবেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন : যখন হযরত মুসা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট গমন করলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর বন্দা! তুমি কে? তোমার কি পরিচয়? তখন তিনি বললেন, আমি মুসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসহার এবনে কাহেস এবনে লাবী এবনে ইয়াকুব। এরপর তিনি তাঁর জন্মের ঘটনা, দুগ্ধ পানের ঘটনা, তাঁকে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়ার কথা, কিবতী হত্যা ও তাঁকে হত্যার চেষ্টা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলেন। হযরত শোয়ায়ব (আঃ) বললেন, এখন আর ভয়ের কারণ নেই, কেননা আমাদের দেশে এসে ফেরাউনের লোকেরা দৌরাত্ম করবে এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

নারীদ্বয়ের একজন বললো, হে আব্বাজান! তাকে আমাদের কাজের জন্যে নিযুক্ত করুন, কেননা শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত এমন লোক নিয়োগ করাই উত্তম। তখন পিতা তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তির মধ্যে এ দু'টি গুণ রয়েছে একথা তুমি কি করে জানলে? সে বললো, যে পাথরটি দশজন লোক একত্রিত হয়ে সরাতে পারত, তা তিনি একাই কূপের মুখ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, তিনি যে শক্তিশালী এর দ্বারাই একথা প্রমাণিত হয়, আর তিনি যে আমানতদার এবং অত্যন্ত সততা-পরায়ণ এর প্রমাণ পেয়েছি এভাবে-আমি যখন তাঁকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম, তখন যেহেতু তিনি পথ চেনেন না, তাই আমি তাঁর আগে ছিলাম। তিনি বললেন না, তুমি পেছনে থাক, যখন পথ পরিবর্তন করতে হয়, তখন তুমি কংকর নিক্ষেপ করবে, আমি বুঝব আমাকে এ পথে চলতে হবে।

১। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৩, পৃঃ ২৭১

তিনজন বুদ্ধিমান

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী পাওয়া যায়না।

(এক) হযরত আবু বকর (রাঃ। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্বাচন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

(দুই) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ক্রেতা, তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আঃ) কে চিনে ফেলেছিলেন এবং চড়ামূল্যে ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন, একে ভালভাবে রাখ।

(তিন) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যা, যিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর সম্পর্কে সুপারিশ করেছিলেন, তাঁকে আমাদের কাজে নিযুক্ত করুন। অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ)-কে এক নজরেই তিনি চিনে ফেলেছিলেন।[১]

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

সে বললো, আমি আমার দু'টি কন্যার একটিকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই।

হযরত মুসা (আঃ)-এর বিয়ের পয়গাম

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তখন হযরত মুসা (আঃ)-কে বললেন, আমার দু'টি কন্যার মধ্যে একটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে চাই।

জোবায়ী (রাঃ) বলেছেন, কন্যাদ্বয়ের নাম ছিলো সফূরা এবং লাইয়া।

এবনে এসহাক বলেছেন, নাম ছিলো সফূরা এবং শারকা।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সফূরা এবং সোফায়রা।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রাঃ) বলেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গেই মুসা (আঃ)-এর বিয়ে হয়েছিলো। আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে হযরত মুসা (আঃ)-এর বিয়ে হয়েছিলো। তাঁর নাম ছিলো সফূরা। আর এ সফূরাই হযরত মুসা (আঃ)-কে ডাকতে গিয়েছিল। তেবরাণী হযরত আনাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বগভী (রাঃ) লিখেছেন, হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে কোন্ মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল? তখন তোমারা বলবে, ছোটটির সঙ্গে। সে-ই তাঁকে ডাকতে গিয়েছিল এবং পিতার নিকট তাঁকে কার্যে নিয়োজিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলো।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০. পৃঃ ২৪-২৫
তফসীরে মাজাহারী, খন্ড-৯,পৃঃ ১১০-১১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০.পৃঃ ২৫
তফসীরে মাজাহারী, খন্ড-৯,পৃষ্ঠা ঃ ১১১-১২

عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ

শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, আমার একটি মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে তুমি আট বছর আমার এখানে কাজ করবে।

فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করে যাও তবে তা হবে তোমার থেকে এহসান এবং তা তোমার ইচ্ছাতেই হবে, আমার তরফ থেকে এজন্যে কোন প্রকার পীড়াপীড়ি করা হবে না।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ কথাটি বিয়ের প্রস্তাব ছিলো, বিয়ে ছিলোনা, কেননা তিনি হযরত হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট কোন্ মেয়েটির বিয়ে দেবেন তা নির্দিষ্ট করেননি। আর বিয়ের জন্যে তা একান্ত জরুরী। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ পরামর্শের পর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন করেন। হযরত মুসা (আঃ) যে আট বছর সেখানে কাজ করবেন, এটি ছিল তাঁর বিয়ের দেনমোহর।

তফসীরকারকগণ লিখেছেন, যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যা হযরত মুসা (আঃ)-এর শক্তি এবং আমানতদারীর প্রশংসা করেছিলেন, তখন তিনি মনে করেছেন যে এই যুবক তার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়, যদি আমি তার সঙ্গে এই নবাগত মেহমানের বিয়ে দেই তবে সে রাজী হবে, এরপর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট এ প্রস্তাব দেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বকালের শরীয়তে মানুষের শ্রমকে বিবাহের দেন মোহর করা বৈধ ছিলো। অবশ্য আমাদের শরীয়তে দেনমোহর হিসেবে নগদ অর্থ সম্পদই গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামগণ একমত যে, দেনমোহর স্ত্রীর হক্ব, তার অভিভাবকের হক্ব নয়।

একখানি হাদীসে রয়েছে, দশ দেরহামের নীচে কোন দেন মোহর হয়না।

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ

"আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না"।

سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

"ইনশাআল্লাহ- তুমি আমাকে সদাচারী পাবে"।

অর্থাৎ আমি দশ বছর কাজ করার জন্যে তোমাকে বাধ্য করবো না এবং তোমার কাজের ব্যাপারেও কোন প্রকার কষ্ট তোমাকে দেবনা। আর ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে, তোমার সঙ্গে আচরণে কোন প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০.পৃঃ ২৫
তফসীরে মাজাহারী, খন্ড-৯,পৃষ্ঠা ঃ ১১১-১২

তফসীরকারকগণ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশের 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, বরং কথাটিকে জোরদার করতে বলা হয়েছে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ

হযরত মুসা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললেন, আপনার দেয়া শর্ত আমি মেনে নিলাম, আমার দায়িত্ব আমি পালন করবো, আশা করি আমার যে হক্ব আপনি নির্দিষ্ট করেছেন তা আপনি আদায় করবেন।

اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ

এ দু'টি মেয়াদের যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা। অথাৎ মেয়াদ ছোট হোক বড় হোক, যে কোন একটি পূর্ণ করা আমার ইচ্ছাধীন থাকবে। কিন্তু এরপর আপনি আমাকে কাজ করতে বাধ্য করবেন না।

অথবা, এর অর্থ হলো আট বছর পূর্ণ হবার পর আমি যদি কাজ ছেড়ে দেই, তবে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না।

وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

"আর আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই সাক্ষী রইলেন"।

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত মুসা (আঃ) অবশেষে কতদিন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট অতিবাহিত করেছিলেন? আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে মরদবিয়া একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হযরত মুসা (আঃ) আট অথবা দশ এর মধ্যে কোন্ মেয়াদটি অতিবাহিত করেছিলেন? তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা না করে বলতে পারবনা। যখন তিনি প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না, যে পর্যন্ত জীব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি। (জীব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বলেন, আমি এ মুহূর্তে বলতে পারবনা যে পর্যন্ত মিকাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি। যখন মিকাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন আমি বলতে পারব না যে পর্যন্ত রফিকে জিজ্ঞাসা করি আর রফি বললেন, আমি বলতে পারবনা পর্যন্ত যে পর্যন্ত ইস্রাফীল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি, ইস্রাফীল (আঃ) বললেন, আমিও বলতে পারব না যে পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করি। তখন ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করলেন, হে সম্মান মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী! মুসা (আঃ) কোন্ মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, উভয় মেয়াদের মধ্যে যা পরিপূর্ণ, যা উত্তম-দশ বছর।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ-১৩৮

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ক্রন্দণ

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে শোয়ায়েব (আঃ) এত কাঁদতেন যে তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক পুনবায় তাঁকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তারপরও তিনি এত কাঁদতেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। আল্লাহ পাক তাঁকে আবার দৃষ্টিশক্তি দান করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'এ ক্রন্দনের কারণ কি? তুমি কি জান্নাতের আকাংক্ষায় কাঁদো, নাকি দোযখের ভয়ে'? হযরত শোয়ায়েব (আঃ) আরজ করলেন, 'না' হে আমার পরওয়ারদেগার! (আমি জান্নাতের আকাংক্ষায় বা দোযখের ভয়ে কাঁদি না) বরং আপনার দীদারের আশায় ক্রন্দন করি'। তখন আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন, 'যদি তাই হয় তবে আমার দীদার তোমার জন্যে মোবারক হোক। (অর্থাৎ এ দৃষ্টি-শক্তিহীন অবস্থা তোমার জন্যে বরকতময় হোক, এ অবস্থাই তোমাকে আমার দীদার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে)। হে শোয়ায়েব! আমি তোমার কাজ করার জন্যে মুসাকে তোমার খাদেম বানিয়ে দিয়েছি'।

হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির ইতিকথা

চুক্তির সময় সীমা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর কন্যাকে হুকুম দিলেন যে মুসাকে লাঠি এনে দাও, যেন সে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বকরীর হেফাজত করতে পারে। এই লাঠিটি কেমন এবং কোন্‌টি ছিল এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। একরামার ধারণা হলো যে হযরত আদম (আঃ) এই লাঠিটি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর এন্তেকালের পর জিব্রাঈল (আঃ) এই লাঠিটি নিজের কাছে রেখে দেন। মুসা (আঃ)-এর নিকট এক রাতে এসে তাঁকে দান করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আস' নামক একটি বৃক্ষের। হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন। এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে এর উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। নবী ব্যতীত কেউ এই লাঠি লাভ করেনি। এভাবে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত আসে। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত আসে। এরপর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) লাভ করেন। অবশেষে শোয়ায়েব (আঃ)-মুসা (আঃ)-কে দান করেন।

সুদ্দী বর্ণনা করেন যে একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে এ লাঠিটি শোয়ায়েব (আঃ)-এর কাছে আমানত রেখেছিলেন। যখন শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর কন্যাকে লাঠি আনার হুকুম দিলেন তখন তিনি এই লাঠিটি নিয়ে আসেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, এই লাঠি ফেরত নিয়ে যাও, অন্যটি নিয়ে এসো। কন্যা লাঠি ফেরত নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে অন্য লাঠি ওঠাতে চাইলেন। কিন্ত আগের ঐ লাঠিটি ছাড়া আর কোন লাঠি হাতে উঠলো না। শেষে এ লাঠিটিই উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) আবার তা ফেরত দিলেন। এভাবে তিন বার আনা-নেয়া হলো। অবশেষে শোয়ায়েব (আঃ) মুসা (আঃ)-কে সে লাঠিটিই দিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়ে বললেন, এটা তো এক ব্যক্তির আমানত ছিল, আমি এটা কেমন কাজ করলাম? তিনি তখন মুসা (আঃ)-এর পেছন পেছন

গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাঠি ফেরত চাইলেন। হযরত মুসা (আঃ) ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই লাঠি এখন আমার হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন, যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম আমাদের সামনে আসবে তার ফয়সালা আমরা মেনে নেব। তখন একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে আসলেন। তিনি ফয়সালা করলেন যে এই লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন, তারপর যে সর্ব প্রথম লাঠিটি ধরতে পারবে, লাঠিটি তারই হবে। মূসা (আঃ) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) লাঠিটি আগে ধরার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। হযরত মুসা (আঃ) লাঠি ধরে ফেললেন। এভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) লাঠিটি হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এরপর যখন মুসা (আঃ) চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ করলেন এবং শোয়ায়েব (আঃ) নিজ কন্যাকে তাঁর হাতে সমপর্ণ করলেন, তখন মুসা (আঃ) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতাকে বল, যেন তিনি আমাদেরকে কিছু বকরী প্রদান করেন। স্ত্রী তাঁর পিতার নিকট গিয়ে বকরী প্রার্থনা করলেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, এ বছর দু' বর্ণ বিশিষ্ট যত বাচ্চা হবে তা তোমাদের হবে।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) মুসা (আঃ)-এর আন্তরিক খেদমতের বিনিময় দিতে এবং নিজ কন্যার রক্তের দাবী মেটাতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এ বছর যত দু' বর্ণের বাচ্চা তা নর হোক অথবা মাদী উভয় প্রকারই তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-কে স্বপ্নে জানিয়ে দিলেন, বকরীর দল যেখানে পানি পান করে সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর। মুসা (আঃ) জাগ্রত হয়ে সেই পানিতে লাঠির আঘাত করলেন এবং বকরীর পালকে সেই পানি পান করানো হলো, যত বকরী সেই পানি পান করেছিল তাদের সব বাচ্চাই সাদা-কালো বর্ণের হয়েছিলো।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বুঝলেন এটা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নছীব। আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-এর জন্য এ রিয্ক দান করেছেন। তাই শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং সকল সাদা-কালো বর্ণের বাচ্চা হযরত মুসা (আঃ)-কে দান করলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১১৩-১৫

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ
الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ
مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ
اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاَنْ
اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ
يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৯) এরপর যখন মুসা (আঃ) তার মেয়াদ পূর্ণ করে এবং তার পরিবাববর্গ নিয়ে যাত্রা করে, তখন তূর পর্বতের দিকে একটি আগুন দেখতে পায়, সে তার পরিবারকে বলে, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়তো তোমাদের জন্যে সেখান থেকে খবর অথবা আগুন নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুনের তাপ নিতে পার।

(৩০) যখন মুসা (আঃ) আগুনের নিকট পৌছলো, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের বরকতময় ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হলো "হে মুসা! আমিই আল্লাহ, বিশ্ব প্রতিপালক"।

(৩১) আরো বলা হলো, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর (লাঠিটি নিক্ষেপ করা মাত্র তা এক অজগরে পরিণত হলো), এরপর যখন মুসা (আঃ) তাকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখলো তখন পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো এবং পশ্চাতে ফিরেও তাকালো না, তখন (আদেশ হলো) হে মুসা! সম্মুখে আস আর ভয় করোনা, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ থাকবে, তোমার কোন আশংকা নেই।

তফসীরুল কোরআন

মিসরের পথে হযরত মুসা (আঃ)

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ

হযরত মুসা (আঃ) শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করলেন,

অর্থাৎ দশ বছর যাবত হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রইলেন এবং তাঁর বকরীগুলোর দেখাশুনা করলেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাদয়ান থেকে মিসরের দিকে রওয়ানা হন। যখন তাঁরা তুর পর্বতের নিকট পৌঁছেন, তখন রাত হয়ে যায়, অন্ধকারে আচ্ছন্ন চতুর্দিক, তুহীন শীত, এদিকে তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু তাই নয়; ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনাও শুরু হয়, শীতের প্রকোপের দরুণ একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল ঐ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী, তিনি তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন।

قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا

"তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়তো তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কোন খবর অথবা আগুন নিয়ে আসতে পারব"।

হযরত মুসা (আঃ) আগুন দেখে বুঝলেন হযতো সেখানে কেউ আছে যার দ্বারা আমি সাহায্য পেতে পারি, সে আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, যদি সেখানে কোন পথ-প্রদর্শক পাওয়া না যায় তবে এতটুকু উপকার হবে যে কিছু জ্বলন্ত অংগার হলেও নিয়ে আসতে পারব, যাতে করে তুমি শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের جذوه শব্দটি সেই জ্বলন্ত লাকড়ীকে বলা হয়, যার কিছু অংশ জ্বলে গেছে। جذى এর বহু বচন হয়।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ

যখন মুসা (আঃ) আগুনের নিকট পৌঁছলো, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের বরকতময় ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হলো, হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্ব প্রতিপালক।

অর্থাৎ হে মুসা! যে আগুন তুমি দেখছ তা আমার নূরের তাজাল্লী, আর যে কথা তুমি শ্রবণ করছো, তা আমারই মহান বাণী, আর এ বৃক্ষ, এ স্থান আর যেদিক থেকে তুমি এ শব্দ শ্রবণ করছো সেদিক-এসব কিছুই আমার তাজাল্লী অবতরণের স্থান, আমার পবিত্র সত্তার স্থান নয়; কেননা তা স্থান কাল দিক থেকে পবিত্র এবং উর্দ্ধে।

অতএব, হযরত মুসা (আঃ) দূর থেকে যে আগুন দেখেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আগুন ছিলোনা, বরং এটি ছিল মহান আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী, আগুনের আকৃতিতে যার প্রকাশ ঘটেছে, যার সন্ধানে মুসা (আঃ) বের হয়েছিলেন।

হযরত মুসা (আঃ) ডাক শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের মহান বাণী, কেননা যখন কোন নবী রসূলের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হয়, তখন কখনো তাদের অন্তরে সন্দেহ হয়না, আর আল্লাহ পাকের মহাণ বাণী

হিসেবে বুঝতেও এতটুকু বিলম্ব হয়না।

হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত লাভ

আলোচ্য আয়াতে الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ দ্বারা পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুওয়্যত ও রেসালত দানে ধন্য করেছেন।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'মোবারাকাহ' শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র আল মোকাদ্দাস শব্দটি এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

الشجرة (বৃক্ষ)

এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিলো সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিলো আওজাহ।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, এর নাম ছিলো আলীক বৃক্ষ।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি ছিলো আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

আর সূরায়ে নাম্‌লে এরশাদ হয়েছেঃ

اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

এবং সূরায়ে তোয়াহায় এরশাদ হয়েছেঃ

اَنَا رَبُّكَ

তফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লেখিত সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআনে করীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরায়ে তোয়াহায় এরশাদ হয়েছেঃ

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

"(হে মূসা!) তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছ"।

আর সূরায়ে নাম্‌লে এরশাদ হয়েছেঃ

بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

যে আগুনের সন্ধানে রয়েছে, সে মোবারক, এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মুসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ "যারা তার চার পার্শ্বে রয়েছে"-এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত ও রেসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মোজেযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

হে মুসা! তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর, যখন হযরত মুসা (আঃ) তাঁর লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট অজগরে পরিণত হলো।

فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

এরপর যখন মুসা তাকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালো না, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ হলোঃ

يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ

"হে মুসা! সম্মুখের দিকে আস, আর ভয় করোনা, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে থাকবে, তোমার কোন আশংকা নেই"।

অর্থাৎ এ অজগর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না, দুশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মোজেযা দেয়া হয়েছে। একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত মুসা (আঃ)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করতো সেদিকের পাথরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে মুসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্যে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১১৬
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কুরআন, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠাঃ ২২৯-৫৯ এবং তফসীরে নূরুল কুরআন, খন্ড-১৯, পৃঃ ২৪৫-৫১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু,) পারা-২০, পৃ ঃ ২৭

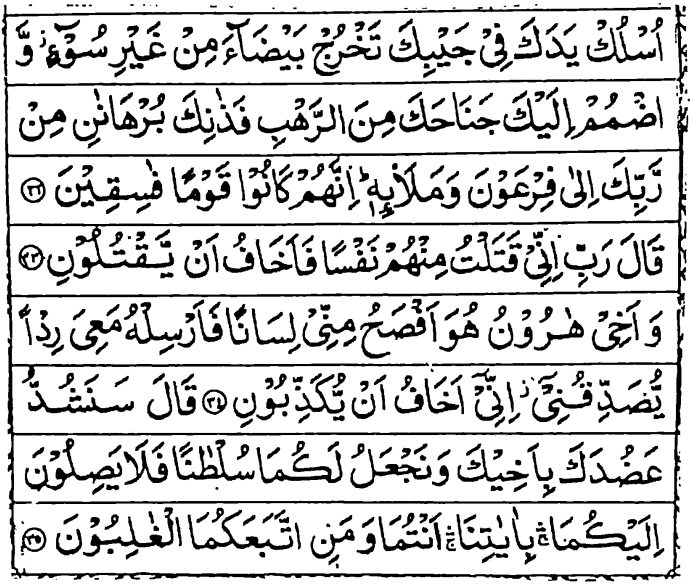
اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّ
اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ
رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾
وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً
يُّصَدِّقُنِيْٓ ۡ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ
عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩২) (হে মুসা!) তোমার হাত জামার বুকের অংশের ভেতর স্থাপন কর, তা কোন প্রকার ব্যাধি ব্যতীতই অত্যন্ত দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পাবে। ভয় দূর করার নিমিত্তে তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর, এ দু'টি হলো তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরাউন ও তার দলবলের জন্যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান সম্প্রদায়।

(৩৩) মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম, তাই তারাও আমাকে হত্যা করবে বলে আশংকা করছি।

(৩৪) আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিকতর বাগ্মী, অতএব তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ কর, তিনি আমাকে সত্যায়িত করবেন। আমি আশংকা করি যে তারা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে।

(৩৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করবো, তাই তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবেনা। আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, তোমরা এবং তোমাদের সাথীগণ প্রাধান্য বিস্তার করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর একটি মোজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মোজেযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মোজেযা ছিল মুসা (আঃ)-এর

লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ংকর অজগরে পরিণত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাড়াত। হযরত মুসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মোজেযা হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া, হযরত মুসা (আঃ) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করতো এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মোজেযাটি ছিলো হযরত মুসা (আঃ)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি নিদর্শন হলো হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি দ্বারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হস্ত দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারেনা।

যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনি তূর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তুমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তুমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তুমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।[১]

مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ

অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ)-এর হাত যে আলোকময় হতো, তা কোন রোগের কারণে নয়; যেমন শ্বেতরোগের কারণে মানুষের হাত সাদা হয়ে যায়; বরং এটি ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা। যেহেতু পরিবর্তিত তৌরাতে হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতের মোজেযাকে শ্বেত রোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ বাক্য দ্বারা পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এটা কোন রোগ নয়, বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে মুসা (আঃ)-এর হাত নূরাণী হতো। এটি অন্যতম মোজেযা।[২]

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

ভয় দূর করার পন্থা

তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর পর যে কোন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু' বাহু নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। কোন কোন

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৫, পৃঃ ৩১৪
২। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৬৩৯

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সৎ সাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে সে এসব গুণাবলী অর্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর, কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূর হয়।

ফররা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جناح শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই এরশাদ হয়েছে যে তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রুপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ এই লাঠি এবং আলোকময় হাত- এ দু'টি মোজেযা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্যে এ দুটি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নবুওয়্যত ও রেসালতের এ দু'টি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের নিকট যাও।[১]

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

"মুসা বললো, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম, তাই তারাও আমাকে হত্যা করবে বলে আশংকা করছি"।

ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে যে হযরত মুসা (আঃ) একজন মজলুম বণী ইসরাঈলকে সাহায্য করতে গিয়ে জনৈক জালেম কিবতীকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে, তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। ফেরাউনের জল্লাদরা এ আদেশ কার্যকর করতে বের হয়েছিলো। দশ বছর পূর্বে এ পরিস্থিতিতে হযরত মুসা (আঃ)-কে মিসর থেকে বের হয়ে মাদয়ানে চলে যেতে হয়েছিলো। এখন হযরত মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নবী ও ও রসূল মনোনীত করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে, তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করেন যে অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় আমার হাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল, আমার আশংকা হয়, হয়তো তারা দেখা মাত্রই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমনি অবস্থায় আমি তাদের নিকট আপনার

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১১৭-১৮

পয়গাম কি করে পৌছাবো। তাদেরকে তবলীগ করার পূর্বেই আমার কাজ তারা শেষ করে দেবে, আল্লাহ পাক তখন হযরত মুসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দেন যে এমন অবস্থা কখনো হবেনা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى (সূরায়ে তোয়াহা)

অর্থাৎ তোমরা কোন ভয় করোনা, কেননা আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সব কথাবার্তা হবে তা আমি শুনতে পাব এবং তোমাদের সাথে যে আচরণ করবে তা-ও আমি দেখতে পাব।[১]

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً

আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিকতর বাগ্মী, তাই তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারী হিসেবে দিন, যাতে করে সে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার মহান বাণী ফেরাউনের নিকট পৌছাতে পারে এবং রেসালতের দায়িত্ব পালনে আমার সাহায্যকারী হয়।[২]

يُصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ

অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে সত্যায়িত করবেন এবং আমার কথাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবেন এবং তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূর করবেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি হারুনকে আমার সাথে নবী মনোনীত করে প্রেরণ কর, তবে তার যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে ফেরাউন আমার প্রতি ঈমান আনতেও পারে। তবে আমি আশংকা করি যে সে আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে এবং তোমার নবী রসূল হিসেবে সে আমাকে মেনে নেবেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যদি হারুন আমার সঙ্গে থাকে তবে সে আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবে এবং আমার কথাগুলো সে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে আর তার কারণে আমার হাত শক্তিশালী হবে।

এতদ্ব্যতীত, একজনের স্থলে দু'জন হলে এ মহান দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হবে। পক্ষান্তরে, যদি আমি একা থাকি, এমন অবস্থায় আমার আশংকা হয় যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার নবুওয়্যতের দাবীকে মিথ্যা জ্ঞান করবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করবো। এমন অবস্থায় তারা তোমার নিকট

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কুরআন, খন্ড-৫, পৃঃ ২৫৫এবং খন্ড-১৯ পৃঃ ৯৯-১০৭
২। হযরত মূসা (আ.)-এর জিহবা পুড়ে যাওয়ার ঘটনা বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১৬, পৃঃ ২৩৬

পৌঁছতেই পারবেনা।

অর্থাৎ হে মুসা! আমি তোমার আরজী কবুল করেছি, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করবো, তোমাদেরকে এমন প্রাধান্য দেব যে তোমাকে হত্যা করার তো প্রশ্নই ওঠেনা; এমনকি কোন প্রকার কষ্ট দেয়ার জন্যে তোমাদের কাছেও আসতে পারবেনা। অতএব, এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত থাক।

بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ

তুমি আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীগণ অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করবে। আমার প্রদত্ত মোজেযা সমূহের কারণে তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। আমার মহিমা বলে তোমরা আধিপত্য লাভ করবে, ফেরাউন এবং তার দল তোমাদের ধারে কাছেও আসতে পারবেনা।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেনঃ এবনে আবি হাতেম তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর অন্তরে ফেরাউনের ব্যাপারে একটু ভয় ছিলো, কেননা সে ছিলো অত্যন্ত বড় জালেম ও স্বেচ্ছাচারী। সে যা ইচ্ছা তা করতো, তাকে বাধা দেয়ার কেউ ছিল না, এমনি অবস্থায় হযরত মুসা (আঃ)-এর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এজন্যে হযরত মুসা (আঃ) যখন তাকে দেখতেন, একটি দোয়া পাঠ করতেন, এর বরকতে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর অন্তর থেকে ফেরাউনের ভয় দূরীভূত করে দিলেন এবং ফেরাউনের অন্তরে মুসা (আঃ)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফেরাউন যখন হযরত মুসা (আঃ)-কে দেখত তখন সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্রাব হয়ে যেত, আর তা হতো গর্ধভের প্রস্রাবের ন্যায়। বায়হাকী তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনের উদ্দেশে যখন দোয়া করেছেন তখন তা যেমন কবুল হয়েছে, ঠিক তেমনি হোনায়েনের যুদ্ধে দুশমনদের বিরুদ্ধে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করেছিলেন, তা-ও তেমনি কবুল হয়েছিল, আর এভাবে যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।[১]

আর দোয়াটি হলো এই,

كنت وتكون وانت حى لا تموت تنام العيون وتنكدر النجوم وانت حى قيوم لا تاخذك سنة ولانوم ياحى ياقيوم

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫ পৃষ্ঠা ১৪০

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ
مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ
لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ فَاَوْقِدْ لِيْ
يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى
اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

তরজমা

(৩৬) এরপর মুসা যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তারা বলে, এটি নিজের রচিত যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষদের যুগে এমন কথা কখনো শ্রবণ করিনি।

(৩৭) আর মুসা বললো, আমার প্রতিপালক ভাল করেই জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে এসেছে, আর আখেরাতে কার পরিণাম হবে শুভ। মূলতঃ সীমালংঘনকারীরা সাফল্য অর্জন করবেনা।

(৩৮) আর ফেরাউন বলে, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ আছে বলে আমি জানি না, অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইঁট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ কর, হয়তো আমি তাতে উঠে মুসার মা'বুদ দেখতে পারি। আর আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে যে হযরত মুসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত ও রেসালতের উচ্চ মর্যাদা দানে ধন্য করা হয়েছে, আর নবুওয়্যতের দলিল স্বরূপ তাঁকে দু'টি বিস্ময়কর মোজেযা দান করা হয়েছে, আর এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে তুমি ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

যখন মুসা (আঃ) ফেরাউনের নিকট তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান, তখন তারা শুধু যে তাঁর আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাই নয়; বরং তারা তাঁকে প্রদত্ত নিদর্শন সমূহকে তাঁর নিজের তৈরী যাদুর খেলা বলে আখ্যা দেয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ

"তারা বললো এটি নিজের রচিত যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

দ্বিতীয়তঃ তারা একথাও বললো, আমাদের পূর্ব পুরুষদের যুগে আমরা কখনো এসব কথা শ্রবণ করিনি। যাকে সে মোজেযা বলে প্রচার করছে, তা নিতান্ত যাদুর ভেল্কি মাত্র। আর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তিনিই বিশ্বের প্রতিপালক-এসব কথাও সঠিক নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমলে আমরা কখনো এমন কথা শ্রবণ করিনি। আসমান জমীনের কোন স্রষ্টা আছে এবং এমন একদিন আসবে যখন তিনি আসমান জমীন ধ্বংস করে দেবেন, এসব কথা আমাদের চৌদ্দ পুরুষেও কেউ শোনেনি (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)।

ফেরাউনের এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার জবাবে হযরত মুসা (আঃ) বলেছেনঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ

তখন মুসা (আঃ) বললো, আমার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন যে কে তাঁর নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে এসেছে, আর আখেরাতে কার পরিণাম হবে শুভ, অর্থাৎ আমি যে সত্যিই আল্লাহ পাকের নবী, আর আমি যে তৌহীদের দিকে তোমাদেরকে আহবান করছি, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আমার প্রতিপালক তা ভালভাবেই জানেন। আর তিনি এ সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত যে কে হেদায়েতের উপর রয়েছে আর কে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে তার সর্বনাশ ডেকে আনছে। আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল যে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর তোমরা বাতিলপন্থী, সত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও তোমরা তা অস্বীকার করছো। আমার রেসালতের প্রতি তোমাদের একীন থাকা সত্ত্বেও তোমরা মৌখিক তা অস্বীকার করছো।

وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ

"আখেরাতে কার পরিণাম হবে শুভ এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত"।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الدار শব্দ দ্বারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর দুনিয়ার এ জীবন-সাধনার শুভ পরিণতি হলো চিরস্থায়ী শান্তির কেন্দ্র-জান্নাত। দুনিয়া হলো কর্মক্ষেত্র, আর এ কর্মের ফল পাওয়া যাবে আখেরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যমে। যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে ঈমান ও নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তারা চির শান্তি চির

মুক্তি লাভ করে।

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"মূলতঃ সীমা লংঘনকারীরা কখনো সফলকাম হবেনা"।

অর্থাৎ দুনিয়াতে হেদায়েত লাভে যেমন তারা সাফল্য অর্জন করেনা, ঠিক তেমনি আখেরাতে নাজাত লাভেও তারা হবে ব্যর্থ।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ

"আর ফেরাউন বলে, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে বলে আমি জানিনা"।

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য

এ আয়াতে ফেরাউনের ঔদ্ধত্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) যখন তাঁকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার এবং তাঁর বন্দেগীর আহবান জানান, তখন সে তার জাতিকে ডাক দিয়ে বলে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলে আমার জানা নেই। আমিই তো তোমাদের উপাস্য। সে হযরত মুসা (আঃ)-কে হুমকি দিয়ে বলে, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে কর, তবে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, ফেরাউন এ বাক্যটির দ্বারা অন্য মা'বুদ বা উপাস্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি, কেননা সে বলেছে যে আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে বলে আমার জানা নেই, এজন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, সে তার প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছে যে একটি আকাশচুম্বি ইমারত তৈরী কর, যাতে আরোহণ করে আমি মুসার মা'বুদ সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন ফেরাউন বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, তখন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার বন্দা ফেরাউন অবাধ্য হয়েছে, আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তাকে ধ্বংস করতে পারি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে জীব্রাঈল! সে আমার বন্দা, আর আমি আমার এ বন্দাকে যে সময় দিয়েছি, তা এখনো শেষ হয়নি। অতএব, যে পর্যন্ত সে সময় না আসে সে পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। কিন্তু এরপর যখন ফেরাউন দাবী করলোঃ

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

"আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে ডাক

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃষ্ঠাঃ২৯

দিয়ে বললেন, "হে জীব্রাঈল! ফেরাউনের ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে"।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে ফেরাউনের এ দু'টি বাক্যের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে পাকড়াও করেন।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ কথার জবাবে শংকিত এবং চিন্তিত হলো যে তার দরবারের লোকেরা হযরত মুসা (আঃ)-এর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। তাই সে তার দরবারের লোকদেরকে ডাক দিয়ে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! এ ব্যক্তি বলে যে একক প্রভু বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অথচ আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য আছে বলেও আমি জানিনা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে ফেরাউন একথা বলতো না যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির সে-ই স্রষ্টা, বরং প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে সে কোন স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসই করতো না, সে মনে করতো যা-কিছু পৃথিবীতে আছে তা আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, যেমন এ যুগের নাস্তিকেরা বলে থাকে। ফেরাউনের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি যে এলাকার শাসকর্তা থাকে সে-ই সে এলাকার মা'বুদ বা উপাস্য হয়, আর এ মানদন্ডের বিচারে যেহেতু ফেরাউন তদানীন্তন মিসরের শাসনকর্তা ছিল, আর তাই সে মনে করতো এ অঞ্চলের অধিবাসীর কর্তব্য হলো তার প্রতি আনুগত্য পেশ করা। আর সে এ কারণেই মানুষকে প্রতারণা করার জন্যে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যা পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ

"হে হামান! তুমি আমার জন্যে ইঁট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ কর, হয়তো আমি তাতে উঠে মুসার মা'বুদকে দেখতে পারি"।

তার মা'বুদ কেমন আর কোথায়? পথিবীতে আমি ব্যতীত আর কাউকে দেখিনা, যদি আসমানে থাকে তবে তা দেখে আসি।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ফেরাউন নাস্তিক ছিল, মহান আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না, আর সে দাবী করতো যে মিসরের একচ্ছত্র ক্ষমতা তার হাতে। অতএব, এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা সে নিজেই, আর এজন্যে সে তার জাতিকে বলতো, আমাকে খোদা মনে করে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, এদিকে মানুষকে হযরত মুসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করার নিমিত্তে তার প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দেয়- ইঁট পোড়াও, সুউচ্চ ইমারত তৈরী কর, আমি তাতে উঠে মুসার খোদাকে দেখব। অবশ্য আমি তো আমাকে ব্যতীত আর কোন উপাস্য আছে বলে জানিনা।

وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

১। তফসীরে আদদুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৪০

এরপর সে আরো বলে যে, আমার ধারণা সে মিথ্যাবাদীদেরর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সে দাবী করছে যে আসমান জমীনের একজন প্রতিপালক আছেন যিনি তাকে রসূল বানিয়ে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। এসবই মিথ্যা দাবী। ফেরাউন কেমন নির্বোধ ছিল তা এ উক্তিতেই প্রমাণিত হয়। কেননা পৃথিবীর কোন সামান্য বস্তুও স্রষ্টা ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করেনা, এমনি অবস্থায় আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী কিভাবে কোন স্রষ্টা ব্যতীতই অস্তিত্ব লাভ করলো? আর কিভাবে এমনি সুন্দর, সুশৃংখল ভাবে পরিচালিত হয়?

ফেরাউনের ইমারত ধ্বংস হলো

বর্ণিত আছে, ফেরাউন এমনি একটি উঁচু ইমারত নির্মাণ করিয়েছিল, যখন ঐ মহলের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো, তখন সে ঐ মহলের ছাদে আরোহণ করে, তার ধারণা ছিল যে আসমানের কাছাকিছি পৌঁছে যাবে, কিন্তু দেখল যে আসমান এতটুকু দূরত্বে রয়েছে, ইতিপূর্বে যে দূরত্বে সে দেখেছিল, এ অবস্থায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং বললো, একটি তীর আসমানের দিকে নিক্ষেপ কর, লোকেরা উপরের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো যা রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসল, তখন ফেরাউন বললো, আমি মুসার খোদাকে হত্যা (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক), তখন আল্লাহ পাকের গজব আপতিত হলো, ঐ ইমারতটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে ভূপাতিত হলো, যে কারণে বহু লোক নিহত হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকাগণ বলেছেন, হামান ফেরাউনের আদেশ পেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার রাজ মিস্ত্রী এবং শ্রমিক একত্রিত করে, তারা সকলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এত উঁচু ইমারত তৈরী করে যা সে যুগে কোথাও ছিলনা। ফেরাউন তার উপরে আরোহণ করে এবং উপরের দিকে তীর নিক্ষেপের আদেশ দেয়, তারা তাই করে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তীরকে রক্তাক্ত করে ফেরত পাঠান। ফেরাউন তা দেখে বললো, আমি মুসার খোদাকে মেরে ফেলেছি (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)। ফেরাউন একটি খচ্চরের উপরে বসে ঐ ইমারতে আরোহণ করেছিলো, আল্লাহ পাক ঠিক সূর্যাস্তের সময় জীব্রাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করেন, জীব্রাঈল (আঃ) তাঁর একটি ডানা দ্বারা আঘাত করেন, পরিণামে ঐ ইমারতটি তিনভাগে বিভক্ত হয়, একভাগ ফেরাউনের সৈন্য বাহিনীর উপরে পড়ে, যে কারণে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়, আরেক ভাগ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়, অপর এক খন্ড সেসব রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকদের উপর পড়ে, যারা ইমারতটি নির্মাণ করেছিল, তারা সকলেই ধ্বংস হয়।[২]

১। জাদুল মাসীর, কৃত-আল্লামা এবনে জওজী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৭
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১২০-২১
তফসীরে আদ্দুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৪

وَاسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৯) ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে থাকে আর তারা মনে করে যে তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবেনা।

(৪০) তাই আমি তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে পাকড়াও করি এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি। অতএব লক্ষ্য করে দেখ যে জালেমদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

(৪১) আর আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম, তারা লোকদেরকে দোযখের দিকে আহবান করতো, কেয়ামতের দিন তাদেরকে কোন প্রকান সাহায্য করা হবেনা।

(৪২) আর এ পৃথিবীতে আমি তাদের পেছনে লা'নত রেখে দিয়েছি, আর কেয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪৩) আর নিশ্চয় আমি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোকে (নূহ সম্প্রদায়, আদ জাতি, সামুদ জাতিকে) ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দান করি, যা মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শক ও রহমত, হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরাউনের ঔদ্ধত্যের কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছিলো। আর এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অহংকারে মেতে উঠেছিলো। তাদের দম্ভ এবং অহংকারের কোন সীমা ছিলোনা, তারা একথা সম্পূর্ণ

বিস্মৃত হয়েছিলো যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যে কোন সময় তাদেরকে পাকড়াও করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

الكبر ردای .....

অহংকার আমার চাদর, যে কেউ এ চাদরে টান দেবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। (আহমদ, আবূ দাউদ, এবনে মাজা)

অহংকার পতনের কারণ হয়

বস্তুতঃ অহংকার পতনেরই কারণ হয়। ফেরাউনের অহংকার, ঔদ্ধত্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, মানুষের প্রতি জুলূম-অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা চরম অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا .....

"ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে থাকে, আর তারা মনে করে যে তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবেনা"।

অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দলবল শুধু যে দম্ভ অহংকার করতো তাই নয়; বরং তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করতো না। অবশেষে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটবে, প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে এবং তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেবেন-এসব কথায় তারা বিশ্বাস করতো না, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ

"আর তারা মনে করেছে যে কখনও আমার নিকট তাদেরকে ফিরে আসতে হবেনা"।

আলোচ্য আয়াতে ফেরাউনের দু'টি অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এক, অহংকার দুই, আখেরাতে প্রতি অবিশ্বাস।

মানুষ যখন অহংকারী হয, ধরাকে সরা জ্ঞান করে তখন সে আসলে ইবলিসেরই অনুসারী হয়, যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সম্মানসূচক সেজদা দিতে বলেছিলেন তখন সে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"সে আদম (আঃ)-কে সেজদা দিতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে। মূলতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত"।

আল্লাহ পাক যখন ইবলিসকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে দম্ভ-ভরে বললোঃ

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

"আমাকে তুমি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর আদমকে সৃষ্টি করেছ কাঁদামাটি দ্বারা (আগুন উর্দ্ধগামী, তাই আদমের নিকট ছোট হতে পারিনা)"।

ইবলিসের এ অহংকারই তার ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যে গুনাহ লোভ-লালসার কারণে হয়, তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, যে গুনাহ অহংকার এবং আত্মম্ভরীতার কারণে হয়, তা ক্ষমা করা হয়না।

হযরত মুসা (আঃ) সমীপে ইবলিস

বর্ণিত আছে, একবার ইবলিস হযরত মুসা (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং মুসা (আঃ)-কে বলে, হে মুসা! আপনাকে আল্লাহ পাক নবুওয়্যত ও রেসালতের সম্মানে ধন্য করেছেন এবং আপনার সাথে সরাসরি কথাও বলেছেন। হযরত মুসা (আঃ) একথার জবাবে বললেন, তা অবশ্য, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি এবং তুমি কে? ইবলিস এসব কথার জবাবে বললো, হে মুসা! আপনার প্রতিপালকের নিকট একথা বলুন যে আপনার একটি সৃষ্টি তওবা করতে চায়, তখন আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে মূসা! তুমি তাকে বলো আল্লাহ পাক তোমার আরজী শ্রবণ করেছেন, এরপর তাকে আদেশ দাও সে যেন আদম (আঃ)-এর কবরকে সম্মুখে রেখে সেজদা করে। যদি সে এভাবে সেজদা করে তাহলেও আমি তার তওবা কবুল করবো এবং তার সমস্ত গুনাহও মাফ করে দেব। হযরত মুসা (আঃ) যখন ইবলিসকে একথা বললেন তখন সে ক্রোধান্বিত হয় এবং অহংকার করে বলে, আমি আদমকে বেহেশতে সেজদা করিনি, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে সেজদা করবো না। এ ছিল ইবলিসের অহংকারের অবস্থা, আর ফেরাউন ছিল এ ইবলিসেরই প্রকৃত অনুসারী, তাই ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর আহবানে সাড়া না দিয়ে অহংকার করলো।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ

তাই আমি ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পাকড়াও করলাম এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, তাকে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম এবং তার সকল দর্প চূর্ণ করে দিলাম, লোহিত সাগরে তাদের সলিল সমাধি হলো।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

অতএব, লক্ষ্য করে দেখ যে জালেমদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্যে এটি হলো পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, কখনও অহংকার করোনা, আর কখনও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়োনা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অহংকার সম্পর্কে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা কর, অহংকার করা এমনি বড় অপরাধ যা সর্ব প্রথম শয়তানকে বিনষ্ট করেছে।

হযরত হারেসা এবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দোযখীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেব না? মনে রেখ, যার অন্তর শক্ত, যার দেহ হারাম সম্পদে সৃষ্ট, অহংকার যার অভ্যাসে পরিণত, যাদের অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান তাদের সকলকে আল্লাহ পাক উল্টোমুখি করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকারের সাথে চলাফেরা করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সামনে এমন অবস্থায় নীত হবে, যখন তিনি তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের উচিত তারা যেন নিজেদের পূর্ব পুরুষের নামে গর্ব করা ত্যাগ করে। নতুবা আল্লাহ পাক তাদেরকে মল-মূত্রের কীট থেকেও নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করবেন।

মোহাম্মদ এবনে ওয়াসে বেলাল এবনে বোরাদাহকে বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলতেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দোযখে একটি ময়দান আছে যার নাম হাবহাব, তাতে সকল অবাধ্য ও অহংকারীদের শাস্তি দেয়া হবে।

এই হাদীস বর্ণনা করে ওয়াসে বেলালকে বলেছিলেন, তুমি এ জিনিসগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা কর, এমন যেন না হয় যে তোমাকেও এ ময়দানে নিয়ে শাস্তি দেয়া হয়, এর মর্ম হলো অহংকার করোনা। (আবু ইয়ালা, তেবরানী, হাকেম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য তিল পরিমাণও অহংকার থাকে, আল্লাহ পাক তাকে উল্টোমুখি করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত যখন রোম ও পারস্য জয় করবে, আল্লাহ পাক তখন তাদের একজনকে অপর জনের কর্তৃত্বের অধিকারী করে দেবেন, অর্থাৎ তারা তখন আত্ম কলহে লিপ্ত হবে এবং রক্তপাত করবে।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ

"আর আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম, তারা লোকদেরকে দোযখের প্রতি আহবান করতো। আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবেনা"।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুনিয়াতে এ কাফেররা যেমন কুফর, শেরক ও যাবতীয় পাপাচারের গুরু ছিলো, পাপীষ্ঠদের নায়ক ছিলো, মানুষকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর দিকে আহবান করেছিলো, ঠিক তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে আমি

দোযখীদের দলনায়ক করে দেব, তারা তাদের দলবলকে দোযখের দিকে ডেকে ডেকে নিয়ে যাবে, আর সে কঠিন বিপদের মুহূর্তে কেউ তাদেরকে সাহায্য করবেনা, সেদিন তারা হবে অত্যন্ত অসহায়, চিরদুঃখী, মহা বিপদের সম্মুখীন।[১]

আবদুল মাজেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেহেতু তারা দুনিয়াতে সকল পাপাচারের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং অগণিত মানুষকে অন্যায়-অনাচারের দিকে আহবান করেছে, তাই আখেরাতেও মানুষকে তারা দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। আর তারা এত অসহায় হবে যে কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেনা, এজন্যে কেয়ামতের দিন কোন প্রকার সাহায্যই তারা পাবেনা।[২]

এবনে আবি হাতেম তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তারা মানুষকে পাপাচারের দিকে আহবান করেছে, সত্যের বদলে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাই কেয়ামতের দিন তারা পাপীষ্ঠ লোকদেরকে ডেকে ডেকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রাঃ) লিখেছেন, যেহেতু তারা মানুষকে এমন কাজের দিকে ডাকত যা তাদের দোযখী হওয়ার কারণ হতো, তাই আমি তাদেরকে দোযখীদের নেতা করে দিয়েছি। যারাই তাদের অনুসরণ করবে তথা তাদের প্রদর্শিত পথে চলবে, তারাই হবে দোযখী, আর যে কেউ আল্লাহর রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, সে দোযখী হবে। কেয়ামতের দিন তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করবেনা, তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবেনা, সেদিন তারা হবে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত।[৪]

وَأَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِيْنَ

"আর এ পৃথিবীতে আমি তাদের পেছনে লা'নত রেখে দিয়েছে, আর কেয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে"।

দুনিয়াতেও এরা থাকবে অভিশপ্ত, আল্লাহ পাকের লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত, নবী রসূলগণের লা'নত এবং নেককার বন্দাগণের লা'নত সর্বদা হতে থাকবে। আর আখেরাতেও তারা হবে অভিশপ্ত, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই তাদের জন্যে লা'নত রয়েছে সংরক্ষিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

মন্দ কাজের নেতৃত্ব মহা বিপদের কারণ হবে

এতে একথা প্রমাণিত হয়, পৃথিবীতে যারা মন্দ কাজের আহবান জানায়, কুফর, শেরক ও বেদআতী কাজের দিকে ডাকে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, তাদের কারণে মানুষ পাপাচারে

১। ফাওয়াদে ওসমানী, পৃ-৫০৫
২। তফসীরে মাজেদী, পৃ-৭৮৮
৩। তফসীরে আদদুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃ ঃ ১৪১
৪। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃ ঃ ৩০

লিপ্ত হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে লা'নত দিয়ে থাকেন। যদি তারা দুনিয়াতে মন্দ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, এ নেতৃত্বই পৃথিবীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ গৌরবের বিষয় মনে করা হলেও আখেরাতে তা হবে মহা বিপদের কারণ এবং কঠিন শাস্তির উপকরণ।

আলোচ্য আয়াতের لعنة শব্দটির অর্থ হলো রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া, অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ পাকের, তাঁর ফেরেশতাদের এবং নবী রসূলগণের লা'নত হয়, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত থেকে চির বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ আখেরাতে তাদের শস্তি চির নির্ধারিত, কিন্তু দুনিয়াতেও তারা রেহাই পাবেনা; বরং লা'নত তাদের প্রতি সর্বদাই হতে থাকবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى

"আর নিশ্চয় আমি পূর্বর্তী সম্প্রদাগুলোকে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দান করি যা মানব জাতির জন্যে পথ-প্রদর্শক এবং রহমত, হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করবে"।

এ পর্যন্ত হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা সমাপ্ত হলো। উপসংহারে মানুষের হেদায়েতের জন্যে তৌরাত নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

হযরত মুসা (আঃ)-এর পূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, হযরত হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাদের যুগে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছিলো, যে কারণে তাদের প্রতি আসমানী গজব আপতিত হয়েছে, আর এভাবে তারা ধ্বংস হয়েছিলো। এসব কিছুর পর আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নবী মনোনীত করেন এবং বণী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে তাঁকে তৌরাত দান করেন, তাতে ছিলো মানব জাতির জন্যে পথ-নির্দেশ এবং আল্লাহ পাকের রহমত লাভের পথ ও পন্থা, হয়তো তারা তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে আর যারা উপদেশ গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হয়।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর জমানায় ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ধ্বংস হওয়ার পর আর কোন জাতিকে আসমানী বা জমিনী আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়নি; বরং যারা পরবর্তীকালে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মোমেনদেরকে জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর পর আর কোন জাতিকে আসমানী বা জমিনী আযাব দ্বারা সামগ্রিক ভাবে ধ্বংস করেননি, এমন আযাব যা দ্বারা কোন জাতির মূলোৎপাটন করা হয়েছে, তা মুসা (আঃ)-এর পূর্বেই হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে তৌরাতের কিছু

১। তফসীরে মআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩২০

বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, যেমন তৌরাতে মানুষের জন্যে ছিল হেদায়েত আর আল্লাহ পাকের রহমত লাভের দিক-নির্দেশনা, হয়তো মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যারা সত্য-সন্ধানী, যারা হক্ব কবুল করতে চায়, আল্লাহ পাক তাদের সত্য গ্রহণ করার মত যোগ্যতা প্রদান করেন। পবিত্র কোরআন একে بصيرت বলেছে, তথা সত্যকে বুঝবার ক্ষমতা, যে এ গুণ অর্জন করে সে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, এটি হলো হেদায়েত। আর হেদায়েতের ফলশ্রুতি হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া তথা রহমত লাভ করা। অতএব, সর্ব প্রথম بصيرت এরপর হেদায়েত এবং এরপর রহমত লাভ হয়। রহমত লাভের জন্যে তাই প্রথমে সত্যকে বুঝতে হয়, এরপর আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়, এরপর তার জন্যে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়।[২]

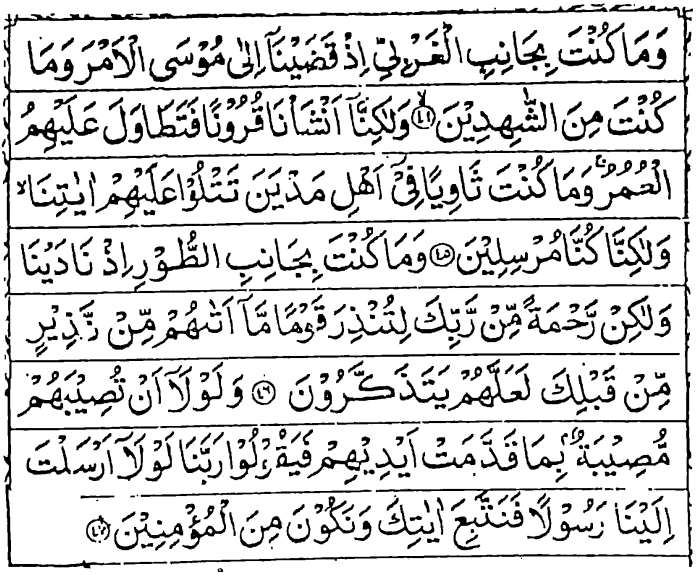
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا
كُنْتَ مِنَ الشَّٰهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۙ
وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ
مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم
مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

তরজমা

(৪৪) আর (হে রসূল!) আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মুসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।

(৪৫) আমি কিন্তু অনেক সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করেছি, তাদের জীবনের সময়ও সুদীর্ঘ হয়েছে আর আপনি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলেন না যে তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবেন, আর আমি অবশ্যই রসূল প্রেরণ করতে থাকি।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০,পৃ ঃ৩০-৩১
২। তফসীরে বয়ানুল কুরআন,পৃ ঃ৭৬৬
তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৭৭৯

(৪৬) আর (হে রসূল!) আপনি তূর পর্বতের পাশেও ছিলেন না, যখন আমি মূসাকে আহবান করেছিলাম, কিন্তু এটি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে দয়া স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৪৭) আর রসূল প্রেরণ না করা হলে তাদের কর্মকান্ডের পরিণতিতে কোন বিপদ হলে তারা বলতো, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল কেন প্রেরণ করলে না, (যদি রসূল প্রেরণ করা হতো) তবে আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম, আর আমরা হতাম মোমেন"।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী (দঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ

এ আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তি, যিনি কোন মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোন কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিন্তু তা সত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ সুস্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনা সমূহ এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেন যেন সে সব তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ

"আর (হে রসূল!) আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মুসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না"।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের وَمَا كُنْتَ শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ (হে রসূল!) আল্লাহ পাক যখন মুসা (আঃ)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর الشَّهِدِيْن শব্দ দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না, অথচ সে সব ঘটনা আপনি বর্ণনা করছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়বী এলম দান করেছেন। কেননা আপনি তাঁর প্রেরিত

নবী, আর সব সত্য ঘটনার সঠিক এলম আল্লাহ্ পাক আপনাকে (মোজেযা স্বরূপ) দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اوتيت علم الاولين والاخرين

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত এলম দান করা হয়েছে।

আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী।

وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

"আর আমি কিন্তু অনেক সম্প্রদায়কেই সৃষ্টি করেছি, তাদের জীবনের সময়ও সুদীর্ঘ হয়েছে"।

আর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে দ্বীনি এলম বিদায় নিয়েছিলো, শরীয়ত তথা জীবন-বিধানের ব্যাপারে যুগের আবর্তন-বিবর্তনে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তারা একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর জাতি থেকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কিছু অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বহু যুগ অতিবাহিত হওয়ার কারণে লোকেরা সে সব অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিলো এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে তারা গাফেল হয়েছিলো। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, যখন আপনার সম্পর্কে আমি মুসা (আঃ)-এর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করি, তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি (হে রসূল!) আপনার অনুরোধ-ক্রমেও মুসা (আঃ)-এর নিকট থেকে আমি এ অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি; বরং আমি আমার নিজের দয়া মায়াতেই এমনটি করেছি, যাতে করে পরবর্তীকালে বিরোধীদের বিরোধিতা করার সুযোগ না থাকে।

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا

"আর (হে রসূল!) আপনি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলেন না যে তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবেন"।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো (হে রসূল!) আপনি মাদয়ানেও ছিলেন না, অথচ মক্কাবাসীকে আপনি মাদয়ানের খবর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন।

وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ

"আর আমি অবশ্যই যুগে যুগে রসূল প্রেরণ করে থাকি"।

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সব মানুষের নিকটই মোজেযা এবং গায়েবী এলম দিয়ে নবী

রসূলগণকে প্রেরণ করে থাকি, যেন তারা হেদায়েত লাভ করে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا

"আর (হে রসূল!) আপনি তূর পর্বতের পাশেও ছিলেন না, যখন আমি মুসাকে আহবান করেছিলাম"।

আয়াতের মর্মকথা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুয়্যতের অনেক দলিল-প্রমাণ এ আয়াত সমূহে বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! মুসা (আঃ)-এর জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁর সীনা প্রান্তরে উপস্থিতি, তাঁর আগুনের সন্ধানে বের হওয়া, নবুওয়্যত লাভ করা, ফেরাউনের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী নিয়ে যাওয়া-এসব কিছু আপনি দেখেননি, আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন না; শুধু তাই নয়, তার পূর্বে মুসা (আঃ) কোথায় এক কিবতীকে এক ঘুষিতে মেরেছিলেন এবং পরিণামে মূসা (আঃ)-কে মিসর ত্যাগ করতে হয়েছিলো, পাড়ি দিতে হয়েছিলো তাঁকে এক অজানা পথ, অবশেষে তিনি মাদয়ানের একটি কূপের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যাদের তিনি সাহায্য করেছিলেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন, তাঁর এক কন্যার সাথে মুসা (আঃ)-এর বিয়ে হয়েছিলো, এসব সত্য ঘটনা (হে রসূল!) আজ আপনি বর্ণনা করছেন, অথচ আপনি এর প্রত্যক্ষদর্শী নন, কোন প্রত্যক্ষদর্শীও এমন সুন্দরভাবে এত ঘটনা বর্ণনা করতে পারেনা। আপনার নবুওয়্যতের পক্ষে এসব কি জ্বলন্ত প্রমাণ নয়? কেননা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জ্ঞানে আপনি ধন্য হয়েছেন বলেই এসব ঘটনা এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারছেন।

মক্কা শরীফে, মদীনা শরীফে আজ নতুন করে তূর পর্বত ও মাদয়ানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। অতএব, (হে রসূল!) এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আপনি মানব জাতিকে সতর্ক করুন। ফেরাউন এত শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অহংকারী হওয়ার কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এরপরও যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করবে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বিরোধিতা করবে, তাদের শাস্তি অবধারিত।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার নসীব করুন, আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তুমি কোন ভাবেই সে অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে আমি তাঁর উম্মতকে ডাকতে পারি এবং তাদের আওয়াজ তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি। মুসা (আঃ) বললেন, অত্যন্ত ভালো। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'হে উম্মতে মোহাম্মদীয়া'! তখন উম্মতে

মোহাম্মদীয়া তাদের পূর্ব পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে লাব্বাইক বলেছে।

আবু জোরা এবনে আমর এবনে জরীর বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন এরশাদ করেছেন, হে উম্মতে মোহাম্মাদীয়া! তখন লোকেরা তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং মায়েদের উদর থেকে জবাব দিয়েছে, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লাকা, লা শারিকা লাকা"-এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আমার রহমত আমার গজব থেকে এবং আমার ক্ষমা আমার আযাব থেকে এগিয়ে আছে অর্থাৎ আমার রহমত প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তোমাদের চাওয়ার আগেই দান করেছি, দোয়া করার পূর্বেই তা কবুল করেছি, আর গুনাহ করার পূর্বেই তা মাফ করেছি। যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এ সাক্ষ্য নিয়ে আসবে যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বন্দা ও রসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি তার গুনাহ সমুদ্রের ঢেউয়ের চেয়েও অধিকতর হয়।

وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"কিন্তু এটি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে দয়া স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে"।

অর্থাৎ একথা সর্বজন-নিবেদিত ও স্বীকৃত যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুসা (আঃ)-এর বৈচিত্র্যময় জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি এ ঘটনাবলীর এমন সুন্দর ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন যা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। এর একমাত্র কারণ এই, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহ পাকই তাঁকে সব কিছু জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে এটি শুধু আপনার প্রতিপালকের রহমত এবং একান্ত দয়া যে তিনি আপনাকে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, ইতিপূর্বে যাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি। কেননা হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর পরে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে আরব জাহানে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। হযরত মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) শুধু বণী ইসরাঈলের নিকট প্রেরীত হয়েছিলেন।[১]

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর যদি রসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোন বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃ ঃ ১২৪-২৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃ ঃ ৩২

নিকট কোন রসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎ কাজ করতাম"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নবী রসূলগণের আবির্ভাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরও দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করা হয়েছে যে নবী রসূল প্রেরণ একটি চূড়ান্ত দলিল। অর্থাৎ এটা সর্বশেষ দলিল যার মধ্য দিয়ে বন্দার জন্যে সকল প্রমাণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের কয়েকটি ওজর-আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে রসূল প্রেরণ করার পর কাফেররা কেয়ামতের দিন আর এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে আমাদেরকে কেন অকারণে আযাব দেয়া হচ্ছে? এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার পরই আযাব এসে থাকে এবং রসূল প্রেরণ হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত দলিল। এরপর অপরাধীদের জন্যে আর কোন ওজর-আপত্তির সুযোগ থাকেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْلَا أَنْ .....

"আর যদি রসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোন বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে কাজ করতাম"।

এ দাবী অনুযায়ী তাদের উচিত ছিলো রসূলের আগমনকে একটি বড় নেয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দ্বীনকে তৎক্ষণাত কবুল করে নেয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

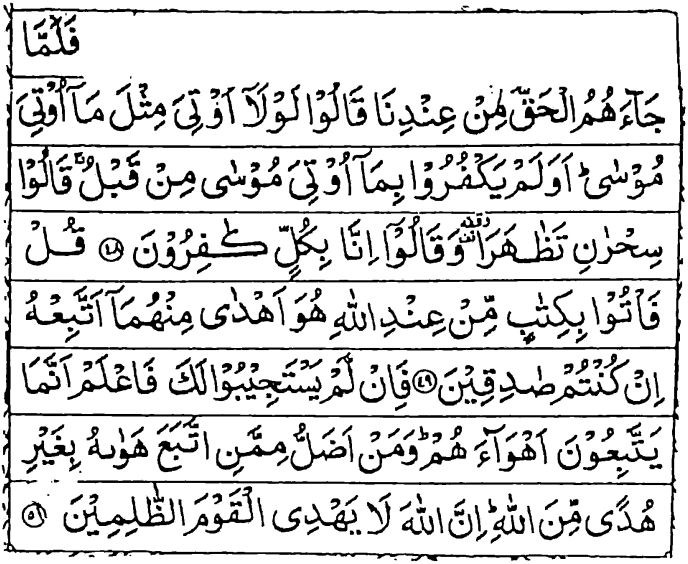
فَلَمَّا
جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ
مُوْسٰى ۭ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۛ قَالُوْا
سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۡ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ۝ قُلْ
فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা

(৪৮) এরপর যখন তাদের নিকট আমার তরফ থেকে সত্য উপস্থিত হয়, তারা বলে, মুসা যেমন পেয়েছিলেন, এই রসূলও তেমন কেন পেলেন না? কিন্তু পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিলো, "দু'টি যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিলো, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি"।

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর, যা এই উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম, তবে তা আমি মেনে চলবো।

(৫০) এরপর (হে রসূল!) তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে, আল্লাহ পাকের পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি কোন নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করলো, অহংকার করলো।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

যখন তাদের কাছে সত্য নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগলো, আপনাকে সে সব মোজেযা কেন দেয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে মুসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল? যেমন মুসা (আঃ)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মোজেযা থাকত তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। শুধু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথাও বলতো, কোরআন যদি তৌরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাযিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কোরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতা-প্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক, কেননা সকল নবী রসূলের মোজেযা একই প্রকার হওয়া জরুরী নয়, আর সমস্ত আসমানী গ্রন্থ একইভাবে নাজিল হওয়াও জরুরী নয়। অথচ পবিত্র কোরআন হলো সমস্ত আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

আবদ এবনে হামিদ, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদীরা মক্কার কোরায়েশদেরকে বলতো যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রসূল? যদি তিনি সত্য রসূল হন, তবে তাঁকে মুসার ন্যায় মোজেযা কেন দেয়া হলোনা, আর এ কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয তবে তৌরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাযিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?[১]

আল্লাহ্ পাক তাদের এসব মূর্খতা-প্রসূত কথা-বার্তার জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে বলেছে, মুসা যেমন মোজেযা পেয়েছিলেন এ রসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের নিকট জিজ্ঞাসা যে তারা কি ইতিপূর্বে মুসাকে (আঃ) অস্বীকার করেনি? প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রসূল প্রেরণ না করলে বলতো আমাদের নিকট কোন রসূল কেন প্রেরণ করা হলোনা? যদি রসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীন কথাবর্তা বলেছে।

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

"তারা বলেছিলো, দু'টিই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিলো, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি"।

তফসীরকারগণ "দু'টিই যাদু"-একথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ

১। তফসীরে আদদুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৪২

করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তৌহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ তৌরাত এবং কোরআনে করীম, আর তৌরাত ও কোরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী।[১]

قَالُوْا

(আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানিনা।)

মক্কার কোরায়েশরা যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যদি অনুরূপ মোযেজা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানিনা, পবিত্র কোরআন ও তৌরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই যাদু মনে করি, হযরত মুসা এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয়ে যাদুকর (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)।

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কোরআন ও তৌরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোন কিতাব নিয়ে আস, যা কোন কিতাবেরই সমকক্ষ হবেনা, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ

"এরপর (হে রসূল!) তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না, এটি তোমাদের দূর্ভাগ্য যে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ), পারা -২০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪

হয় তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।

ইমাম রাজী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় শেরক হলো অত্যন্ত বড় জুলুম"।

অতএব, যারা মুশরেক তারা বড় জালেম, আর এমন সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক তাদের অন্যায়ের কারণেই হেদায়েত করেন না।[১]

পক্ষান্তরে, যারা তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে নেয়না; বরং প্রবৃত্তির দাসত্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ পাকের হেদায়েত গ্রহণ করে তারাই হয় জীবন-সাধনায় সফলকাম।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾
أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

তরজমা

(৫১) আর নিশ্চয় আমি তাদের নিকট অনবরত আমার বাণী প্রেরণ করতে থাকি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৫২) ইতিপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম তারা তাতে বিশ্বাস করে।

(৫৩) যখন তাদের নিকট তা তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, "আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত ধ্রুব

১। তফসীর কবীর; খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১

সত্য। আমরা তো পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম"।

(৫৪) তারাই সে সব লোক, যাদেরকে দ্বিগুণ হারে প্রতিদান দেয়া হবে, কেননা তারা ছিলো ধৈর্যশীল। তারা মন্দের প্রতি উত্তরে ভাল করে, আর আমার প্রদত্ত রিয্ক থেকে (আল্লাহর পথে) তারা কিছু কিছু ব্যয় করে থাকে।

(৫৫) আর তারা যখন অযথা কথা শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং (শান্ত ভাবে) বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি তোমাদের জন্যে, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা নির্বোধ লোকদের সঙ্গ চাইনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, এভাবে মানুষের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে করে কেউ কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে রসূল প্রেরণের মাধ্যমে যদি আমাদের হেদায়েতের সুযোগ দেয়া হতো, তবে আমরাও মোমেন হতাম। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে আমি হক্ব বা সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আমার বাণীকে বার বার প্রেরণ করেছি, কোরআনে করীমকে ধারাবাহিকভাবে অনবরত নাজিল করেছি, যাতে করে মানুষ তার মর্মবাণীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা স্মরণ করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কোরআন নাজিল করলে এ সুযোগ হতো না।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

"আর নিশ্চয় আমি তাদের নিকট আমার বাণী প্রেরণ করতে থাকি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

অর্থাৎ আমি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে সময় এবং প্রয়োজনের দাবীতে বার বার আমার বাণী প্রেরণ করেছি। এক আয়াতের পর দ্বিতীয় আয়াত, একটি নসিহতের পর আরেকটি নসিহত প্রেরিত হতে থাকে, যাতে করে সকলেই হেদায়েতের সুযোগ লাভ করে, 'হেদায়েতের পথ পাইনি'- একথা কেউ বলতে না পারে।

অথবা এর অর্থ হলো, আমি তাদের জন্যে হেদায়েতের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছি, যাতে করে গোমরাহীর অন্ধকার কেটে যায়, তাদের মনের সকল প্রশ্নের জবাব তারা পেয়ে যায় এবং হেদায়েত কবুল করে।

অথবা এর অর্থ হলো, আমি হক্ব কথাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে করে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ না থাকে।

অথবা এর অর্থ হলো, আমি কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার পূর্ববর্তীকালের

যে উম্মতদের উল্লেখ করেছি, যাতে করে তাদের সে করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।[১]

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মর্মস্পর্শী এবং জীবন্ত

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো, আমি পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ নাজিল করার ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা রেখেছি যেন মানুষ সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষায়, আহবানে, সুসংবাদে, সতর্কবাণীতে, বিভিন্ন উপদেশমূলক ঘটনার বর্ণনায় এমন একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী, আকর্ষণীয়, মর্মস্পর্শী এবং জীবন্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) وصلنا শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছি যাতে কোন অস্পষ্টতা বা আড়ষ্টতা নেই।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক বারংবার এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, আমি মক্কার কাফেরদের জন্যে কোরআনে করীমে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছি এবং একথা বলেছি যে, আল্লাহর নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলে তথা নাফরমানী করলে তার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এ কারণে পূর্বকালের উম্মতদের প্রতি আযাব এসেছিল।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো আমি দুনিয়ার খবরের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কথাও একত্রিত করে দিয়েছি যাতে করে পবিত্র কোরআনের পাঠক মাত্রই দুনিয়াতে অবস্থান কালেই আখেরাতের দৃশ্য দেখতে পায়।

এবনে জরীর, তাবারী এবং তেবরানী রোফাআ কারযীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত যে দশজনের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, আমি তাদের অন্যতম।

এবনে জরীর আলী এবনে রোফাআর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আহলে কেতাবের মধ্য থেকে দশ ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং ইসলাম কবুল করে, তন্মধ্যে রোফাআ ছিলেন অন্যতম। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।[২]

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُونَ

"ইতিপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম তার তাতে বিশ্বাস করে"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব লোকদের সমালোচনা করা হয়েছে এবং শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগত সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের হীন স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে, আর এ আয়াতে সে সব সত্যান্বেষী

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ২২৪-২৫
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১২৮

লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা বিনা দ্বিধায় সত্যকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবীগণের শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

হযরত সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর তরফ থেকে প্রেরিত ৭০ জন খৃষ্টান ধর্মজাযক যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন, তখন তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াছিন পাঠ করে শোনালেন, তারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে ক্রন্দণ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত-

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ..... سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ

নাযিল হয়েছে।[১]

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মুশরেকরা বলতো আমরা তৌরাতও মানিনা, কোরআনও মানি না, কিন্তু আহলে কেতাবের মধ্যে কিছু সংখ্যক নেককার লোক ছিলেন, তারা পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পূর্বে তৌরাতকে মানতেন এবং পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পর পবিত্র কোরআনকে মানেন।

শানে নজুল

এবনে জরীর কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কেতাবের দশজন লোক সত্যের অনুসারী ছিলেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়, তখন তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। (বগভী, এবনে মরদবিয়া)

তেবরাণী আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সাথীদের মধ্য থেকে চল্লিশ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সপ্তম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খায়বরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়েছিলেন। খায়বরের ঘটনার পর তাঁরা দেখলেন মুসলমানগণ অত্যন্ত দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, তাই তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা অর্থ-সম্পদশালী লোক, আমাদেরকে অনুমতি দান করুন আমরা যেন অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসতে পারি এবং মুসলমানগণের সাহায্য করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে আবি হাতেম সায়ীদ এবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত জাফর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীগণ যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন, তখন

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ২২৪-২৫

নাজ্জাশী তাঁদের মেহমানদারী করেন এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন, যখন তাঁরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন নাজ্জাশীর দেশের সীমান্তের অধিবাসী কিছু লোক নাজ্জাশীর নিকট বলেন যে আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি এবং সামুদ্রিক সফরে তাঁদের খেদমত করতে পারি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে পুনরায় আমরা ঈমান আনব, নাজ্জাশীর অনুমতি-ক্রমে তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, ওহোদ, খায়বর এবং হোনায়েনের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই শরীক হলেন, এরপর তাঁরা অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, আমাদেরকে দেশে ফেরত যেতে দিন, আমাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তা দেশ থেকে এনে আমরা মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই, কেননা মোহাজেরগণ আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত কষ্টে রয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা দেশে চলে গেলেন এবং অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন, তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আহলে কিতাবের আশি ব্যক্তির সম্পর্কে, তন্মধ্যে বিশজন ছিলেন নাজরানের অধিবাসী, বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী, আটজন ছিলেন সিরিয়া থেকে আগত।[১]

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

"যখন তাদের নিকট তা তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত ধ্রুব সত্য। আমরা তো পূর্বেই আত্ম সমর্পণকারী ছিলাম"।

'আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি'-একথার তাৎপর্য হলো, আমরা তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

'আমরা তো পূর্বেই আত্ম সমর্পণকারী ছিলাম'-একথার তাৎপর্য হলো, হযরত ঈসা (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, তার প্রতিও আমরা আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তৌরাত এবং ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা ছিল। অতএব, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের ঈমান নতুন কিছু নয়, বরং পূর্ব থেকেই ছিল।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯

আহলে কেতাব মোমেনদের জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ

তারাই সে সব লোক যাদেরকে দ্বিগুণ হারে প্রতিদান দেয়া হবে। একবার তাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য, আর সেই কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পূর্বে ঈমান আনয়নের জন্যে এবং দ্বিতীয়বার পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পর তার প্রতি ঈমান আনার জন্য।

بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব এজন্যে দেয়া হবে যে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে তারা বহু বিপদাপদের মোকাবেলা করেছে এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, দুনিয়ার হীন স্বার্থের কারণে সত্য গ্রহণে বিরত হয়নি, বরং জাগতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে। শত বিপদের মোকাবেলা করেও ঈমানের উপর টিকে রয়েছে, যারা এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তাদের শুভ পরিণতির কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদানের সুসংবাদ রয়েছে তারা পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে যেমন ঈমানদার ছিলেন, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পরও ঈমানের উপর কায়েম রয়েছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন আহলে কিতাব পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পূর্বে তার উপর ঈমান রাখতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো, কিন্তু যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো, তখন শুধু হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পূর্বে যে ঈমানের উপর ছিলো তা পরিহার করে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন, যাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। এক, সে আহলে কেতাব যে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে।

দুই, সে গোলাম যে আল্লাহ পাকের হক্বও আদায় করেছে এবং তার মণিবেরও হক্ব আদায় করেছে।

তিন, সে ব্যক্তি যার নিকট একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেয়, এরপর স্বাধীনতা দিয়ে তাকে বিয়ে করে।

এবনে মাজা, মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ হারে সওয়াব দেয়া হবে।

(এক) আহলে কিতাবের এমন এক ব্যক্তি যে প্রথম কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে (অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ব্যতীত অন্য কোন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে) আর শেষ কিতাব তথা পবিত্র কোরআনের প্রতিও ঈমান এনেছে।

(দুই) সে ব্যক্তি যার একটি বাঁদী ছিল, সে তাকে উত্তম শিক্ষা দিয়েছে এবং তাকে বিয়ে করেছে।

(তিন) সে গোলাম যে উত্তমভাবে তার পরওয়ারদেগারের এবাদত করেছে এবং তার মণিবকেও খুশী করেছে।[১]

শেখ আকবর (রঃ) তাঁর রচিত 'ফতুহাতে' লিখেছেন, আহলে কেতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার তারা তাদের নবীর প্রতি দু'বার ঈমান এনেছেন, একবার প্রত্যক্ষভাবে, আর দ্বিতীয় বার আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে, কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী রসূলগণের সত্যায়নকারী ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের উপর ঈমান আনয়ন জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন, ঠিক এমনিভাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও তারা দু'বার ঈমান এনেছেন, একবার সরাসরি আর দ্বিতীয়বার ইতিপূর্বে তাদের নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে, কেননা পূর্বকালের প্রত্যেক নবী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিতেন এবং তাঁর সত্যতার কথা ঘোষণা করতেন। এজন্যে ঈমানদার আহলে কেতাবকে দ্বিগুণ হারে সওয়াব দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক আহলে কিতাব মোমেনগণের প্রশংসা করেছেন। প্রথমতঃ তাদের আকীদা বিশ্বাস এবং ঈমানের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের নৈতিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, কেননা নৈতিক গুণাবলীর মূল ভিত্তিই হলো সবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতা। যদি কেউ এ গুণ অর্জন করে, তবে তার মধ্যে অন্যান্য গুণেরও বিপুল সমাবেশ ঘটে।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

"তারা মন্দের প্রতি-উত্তরে ভাল করে"।

অর্থাৎ তাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তারা শুধু যে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করে তাই নয়, বরং যদি কেউ তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে, তবুও তারা প্রতি-উত্তরে মন্দ ব্যবহার করেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা তৌহীদের সাক্ষ্য দিয়ে কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১২৯
তফসীরে আদদুরুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ২৪৫

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মুশরেকদের পক্ষ থেকে যে সব গাল-মন্দ দেয়া হয়, তার উপর তারা সবর করে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে।

আলোচ্য বাক্যটির একাধিক অর্থ হতে পারে (১) যদি কখনো তাদের দ্বারা কোন মন্দ কাজ হয়ে যায়, তবে তারা ভাল এবং কল্যাণকর কাজের দ্বারা ঐ মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট থাকে। এভাবে তারা নিজেদের নেক আমলের পাল্লা ভারী করে রাখে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর এ অর্থ হতে পারে (২) তারা তাদের দুশমনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে দুশমনের দুশমনীর মোকাবেলা করে, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমার শত্রুতা রয়েছে, যদি তুমি তার প্রতি এহসান কর, তবে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।

এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে (৩) তারা আল্লাহ পাকের এবাদতের মাধ্যমে পূর্বকৃত গুনাহকে দূরীভূত করে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

(নিঃসন্দেহে নেক আমল গুণাহগুলোকে দূরীভূত করে।)

এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মন্দ কাজের পর নেক আমল করে নিও, কেননা তা মন্দ কাজের কুফলকে বিনষ্ট করে দেয়।[২]

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"আর তাদেরকে প্রদত্ত রিয্ক থেকে কিছু (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে থাকে"।

অর্থাৎ তারা অর্থ-সম্পদের লোভে লোভী নয়, অর্থ-সম্পদের মায়ায় মোহে মুগ্ধ থাকেনা, তাই আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে তথা যাকাত, সদকা আদায় করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। তারা আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে এবং তাঁর বন্দাদের কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে ত্রুটি করেনা। এটি হলো আহলে কিতাব মোমেনদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

"আর তারা যখন অযথা কথা শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি তোমাদের জন্যই। তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা নির্বোধ লোকদের সঙ্গ চাই না"।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ২২৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৩০

এ আয়াতে আহলে কেতাব মোমেনদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। মূর্খ অভদ্র লোকেরা যখন তাদের সঙ্গে কখনো আপত্তিকর কথা বলতো, তখন তারা সেদিকে কর্ণপাত করতো না, বরং তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে সচেষ্ট থাকত। কখনো তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত হতো না।

اللغو (অযথা কথা) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আহলে কিতাব মোমেনগণকে পৌত্তলিকরা গালি দিতো এবং তাদেরকে তিরস্কার করে বলতো, তোমরা তোমাদের ধর্ম বর্জন করলে? নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে? তখন মোমেনগণ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না, তাদেরকে বলতেন, "তোমাদের জন্যে রইল সালাম"। এ সালামের অর্থ তাদের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা নয়, তাদেরকে দোয়া করাও নয়, বরং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করা। একথার তাৎপর্য হলো আমরা তোমাদের গালির প্রত্যুত্তরে গালি দেব না, তোমাদেরকে মন্দ বলবো না। আমরা মূর্খ লোকদের সঙ্গ পছন্দ করি না। অর্থাৎ আমরা মূর্খ লোকদের সাথে থাকতে চাইনা। কেননা আমাদের কর্মের ফল আমরা ভোগ করবো, আর তোমাদের কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

অথবা এর অর্থ হলো মূর্খ লোকদের অন্তভুক্ত হতে চাই না, তোমরা আমাদের গালি দিচ্ছ, মন্দ বলছো তার প্রতি-উত্তরে যদি আমরাও গালি দেই, তবে আমরাও তোমাদের ন্যায় মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো, যা আমরা আদৌ পছন্দ করিনা, আমরা তোমাদের ন্যায় মূর্খ হওয়া থেকে আল্লাহর পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, জেহাদের পূর্বে ছিলো এ হুকুম। কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত হয়তো হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর তিনি হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অথবা এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবিসিনিয়ার সেসব লোকদের সম্পর্কে যারা হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে এসেছিলেন। তাদের আগমন হয়েছিলো ষষ্ঠ হিজরীর পর খায়বরের যুদ্ধের সময়। অথবা এ আয়াত নাযিল হয়েছে নাজরানের চল্লিশ ব্যক্তি এবং সিরিয়ার আটজন সম্পর্কে। এ ঘটনা হিজরতের পরেই ঘটেছে, তখন জেহাদের হুকুম নাজিল হয়েছিলো।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৩০-৩১

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ
لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَ
مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

তরজমা

(৫৬) (হে রসূল!) আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না; বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করে থাকেন এবং কারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন।

(৫৭) আর তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে, আমি কি তাদেরকে সম্মানিত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেইনি! যেখানে আমার তরফ থেকে প্রদত্ত রিযক স্বরূপ সর্ব প্রকার ফলমূল ছুটে আসে, কিন্তু অধিকাশ লোকই তা জানেনা।

(৫৮) আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা তাদের ভোগ-সম্পদের কারণে দম্ভ করতো, এসবই তো তাদের বাড়ী-ঘর, তাদের পরে এগুলো অতি সামান্যই আবাদ হয়েছে। আর আমিই তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

(৫৯) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক জনপদগুলোকে সে পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না সেগুলোর কেন্দ্রস্থলে কোন পয়গম্বর প্রেরণ করেন, যে আমার আয়াত সমূহকে পাঠ করে শোনায়। আমি কোন জনপদকে শুধু ঐ অবস্থায় ধ্বংস করি যখন জনপদের অধিবাসীরা জালেম হয়।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে বলেছিলেন, আপনি তৌহীদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করুন, বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যাতে করে কেয়ামতের দিন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারি। কিন্তু আবু তালেব তাতে রাজী হলোনা, সে বললো, যদি কোরায়শের স্ত্রীলোকেরা একথা বলে তিরস্কার না করতো যে আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে, তাহলে আমি অবশ্যই এ কলেমা পাঠ করে তোমার নয়ন মনকে শান্তি দিতাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"(হে রসূল!) আপনি যাকে ভালবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়েত করতে পারেন না, বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করে থাকেন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের হেদায়েতের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন, এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, তারপরও আবু তালেব কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতে রাজী হয়নি, আর এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

মূলতঃ হেদায়েত প্রদান করা-না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, নবীর কাজ হলো সত্য পথ প্রদর্শন করা, তবে কোন ব্যক্তির অন্তরে হেদায়েত প্রবেশ করিয়ে দেয়া একমাত্র আল্লাহ পাকেরই কাজ। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। কার কি যোগ্যতা রয়েছে, সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাকই ওয়াফেকহাল, আর কেউ নয়।

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"কারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে তা এক আল্লাহ পাকই ভালভাবে জানেন"।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কাদের তকদীরে হেদায়েত লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এবনে আসাকের 'তারীখে দামেশকে' এবং ইমাম নেসায়ী আবু সায়ীদ এবনে রাফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু সায়ীদ বলেছেন যে আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছি যে

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

আয়াতখানি কি আবু জেহেল এবং আবু তালেব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ।

বায়হাকী সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে তাঁর পিতার বর্ণনার উদ্ধৃতি

দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আবু তালেবের মৃত্যুর সময় যখন ঘণিয়ে এলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট তশরিফ নিয়ে গেলেন। আবু জেহেল, উমাইয়া এবনে মুগীরা পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবকে বললেন, হে আমার চাচা! আপনি একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করুন, যাতে করে আমি আল্লাহর দরবারে এ কলেমাকে আপনার মাগফেরাতের জন্যে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারি। এদিকে আবু জেহেল বললো, আপনি কি আবদুল মোত্তালেবের ধর্মকে বর্জন করবেন? ঐ মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবকে বারে বারে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করার জন্যে আহবান জানাচ্ছিলেন, কিন্তু আবু তালেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমান আনতে রাজী হয়নি, বরং তার শেষ কথা ছিল আবদুল মোত্তালেবের ধর্মমতে। তার মৃত্যুর পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে যতক্ষণ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিরত না করা হয়, ততক্ষণ আমি আবু তালেবের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন একখানি আয়াত নাজিল হয়েছেঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

"মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মোমেনদের জন্যে অনুচিত"।

আর আবু তালেব সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ নাজিল হয়েছে।[১]

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে হেদায়েত সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে, তাই আবু তালেব হেদায়েতে কবুল না করায় আপনি চিন্তিত হবেন না।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ

"আর তারা বলে, "আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে"।

এবনে জরীর উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কার কোরায়শের কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বললো, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তবে মক্কাবাসী আমাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত হারেস এবনে ওসমান এবনে নওফেল

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৩১-১৩২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৪৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৩৬-৩৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ৩২৭

এবনে আবদে মনাফের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হারেস বলেছিল, আপনি যা বলেছেন, আমরা মনে করি তা সত্য, কিন্তু যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের আশংকা হয়, আরববাসী আমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেবে। (নেসায়ী, এবনুল মুনজের)

ইমাম নেসায়ী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ কথাটি বলেছিল হারেস এবনে আমের এবনে নওফেল।

তাদের একথার জবাবেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ.....

(আর তারা বলে, যদি আমরা আপনার কথা মেনে চলি, তবে আমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে।)

তফসীরকারগণ বলেছেন, যে সব কারণে মানুষ সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, তন্মধ্যে একটি হলো, অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হবার আশংকা বা প্রাণ নাশের আশংকা।

মক্কাবাসী কোন কোন মুশরেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলতো, আপনাকে আমরা সর্বদাই সত্য বলে জানি, আপনার বক্তব্যও সত্য, কিন্তু আপনার প্রতি যদি ঈমান আনি তথা ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আরববাসী আমাদের প্রাণের শত্রু হয়ে যাবে এবং মক্কা থেকে আমাদেরকে বহিস্কার করা হবে, এজন্যে আপনাকে সত্য জেনেও ঈমান আনতে পারিনা।

এ আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতেরও রয়েছে কিঞ্চিত সম্পর্ক। পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত পথ-প্রদর্শক, মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করাই তাঁর কাজ, আর মানুষের করণীয় হলো সে পথে চলা, সত্যের আহবানে সাড়া দেয়া, এ পর্যায়ে মক্কার কিছু কাফের এসে বললো, আমরা জানি আপনি সত্যের দিশারী তবে আমাদের অসুবিধা হলো, যদি আমরা আপনাকে মেনে চলি, তবে আমাদের আশংকা হয় আরববাসী আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং বাড়ী-ঘর থেকে আমাদেরকে বের করে দেবে, আর আমরা তাদের মোকাবেলার শক্তি রাখিনা, এ কারণে আমরা ঈমান আনতে পারিনা।

কাফেরদের একথার জবাবেই এরশাদ হয়েছেঃ

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا

"আমি কি তাদেরকে সম্মানিত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেইনি? যেখানে আমার তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক স্বরূপ সর্ব প্রকার ফলমূল ছুটে আসে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় কাফেরের এ আশংকার কথা বলা হয়েছে যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদেরকে কাফেররা তাদের বাড়ী-ঘর থেকে উৎখাত করে দেবে, আলোচ্য আয়াত থেকে তাদের এ সন্দেহের জবাব দেয়া হচ্ছে।

কাফেরদের সন্দেহের প্রথম জবাব

أَوَلَمْ نُمَكِّن.....

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়বে বলে আশংকা করছো, অথচ তোমরা তোমাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করছো না, আল্লাহ্ পাক কি তোমাদেরকে সম্মানিত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করেননি? বর্তমানে তোমাদের জন্যে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে তা কার দান? একথা সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত যে, বর্বরতার যুগে হত্যা-লুণ্ঠন-ছিনতাই এক কথায় সর্ব প্রকার জুলুম-অত্যাচার অহরহ হতো, সারা পৃথিবীতে কারোই জান-মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না, কিন্তু পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানের কারণে মক্কাবাসী সকলে নিরাপদ থাকত, পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

(আর যে এই মক্কা শহরে (হরম এলাকায়) প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে।)

এ নিরাপত্তা আল্লাহ্ পাকই দান করেছেন। হরম শরীফের সম্মানের কারণেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে মক্কা শহর সম্মানিত। যেখানে কারো পিতার ঘাতকে হাতের নাগালে পেলেও কিছু বলা হয়না, যেখানে হরিণ বাঘের থাবা থেকে, কবুতর চিলের আক্রমণ থেকে থাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শুধু বিশেষ কোন সময়ের জন্যে এ আদেশ নয়; বরং কখনও এ আদেশ অমান্য করা হয় না।

অতএব, তাদের বর্তমান নিরাপত্তা যখন আল্লাহ্ পাক দান করেছেন, তখন তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলে, তাঁর অনুসরণ করলে জান-মালের নিরাপত্তার অভাব হবে বলে আশংকা করা সম্পূর্ণ অমূলক, অহেতুক এবং ভিত্তিহীন। তবে কারো ঈমানের পরীক্ষার জন্যে সাময়িক ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, আর এতে বিচলিত হওয়াও উচিত নয়।

বস্তুতঃ প্রকৃত অবস্থা এই যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যারা বাস করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শুধু যে নিরাপত্তা দান করেছেন তাই নয়; বরং সারা পৃথিবী থেকে তাদের রিয্ক হিসেবে সর্ব প্রকার ফলমূল সরবরাহের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। যদি এ কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ পাকের রহমতে তারা পূর্বের চেয়ে অধিকতর নিরাপত্তা এবং প্রচুর রিয্কও লাভ করবে, শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং আখেরাতে অনন্ত অসীম নেয়ামতও তারা ভোগ করবে।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা"।

কেননা তারা মূর্খ, তারা এসব বিষয়ে চিন্তাও করেনা, তাদের ভয় করা উচিত আল্লাহ্ পাককে, তাদের কুফরী ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ যে আযাব আসবে, সে

আযাব সম্পর্কে তাদের সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু তারা সেদিকে গাফেল, এ কারণেই তারা তৌহীদের প্রতি ঈমান আনেনা। কাফেররা এমনি মূর্খ যে অর্থ-সম্পদের লোভে তারা ঈমান আনয়ন থেকে বিরত থাকছে, অথচ তারা জানেনা যে এ কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ পৃথিবীর কত জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

দ্বিতীয় জবাব

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا

"আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের ভোগ-সম্পদের কারণে দম্ভ করতো, এসবই তো তাদের বাড়ী-ঘর, তাদের পরে এগুলো অতি সামান্যই আবাদ হয়েছে"।

অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বে তাদের ধন-সম্পদের কারণে দম্ভ করেছিলো, সত্যকে তথা তৌহীদকে অস্বীকার করেছিলো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছিলো, তারা তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথচ এমনও দিন ছিল, তাদের ক্ষমতার দাপটে ধরণী থর থর কম্পমান থাকতো, সারা বিশ্ব তাদেরকে ভয় করতো, আজ তারা নিশ্চিহ্ন, নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, তাদের আকাশচুম্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ হয়তো তাদের প্রতি মাতম করছে এবং তাদের অবোধ্য ভাষায় বিশ্ববাসীকে সতর্ক করছে, যেন তারা কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অবাধ্য না হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ.....الاية (সূরা দুখান)

"কত বাগ-বাগিচা, আর কত ঝর্ণা, কত শষ্য-শ্যামলা, কত মনোরম স্থান আর কত অফুরন্ত নেয়ামত যা তারা উপভোগ করছিলো, সবই তারা ছেড়ে চলে গেছে। এভাবেই আমি অন্য জাতিকে এ জগতের উত্তরাধিকারী করেছি। অতঃপর আসমান ও জমিন তাদের জন্যে কাঁদেনি এবং তাদেরকেও কোন প্রকার অবসর দেয়া হয়নি"।

এই তো পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাস। অতএব, এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য, আর এ শিক্ষা হলো আল্লাহ পাকের কুফরী ও নাফরমানীই মানব জাতির জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে, আর হেদায়েত গ্রহণ তথা ঈমান আনয়ন উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভের কারণ হয়।

وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ

"আর আমিই তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী"।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে দম্ভ করা মারাত্মক ভুল, অবশেষে কারোর কিছু থাকেনা, সকলকেই একে একে বিদায় নিতে হয় এ

পৃথিবী থেকে, সব কিছুই এখানে পড়ে থাকে, কারো মালিকানাই শেষ পর্যন্ত টেকেনা, চূড়ান্ত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, আর তা সর্বদা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ (এই বাড়ী-ঘরগুলো) এ বাক্যাংশ দ্বারা সামুদ জাতি এবং লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা আরববাসী ভ্রমণকালে প্রায়ই এসব স্থান দেখতে পেত।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا

"আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক জনপদগুলোকে সে পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না সেগুলোর কেন্দ্রস্থলে কোন পয়গম্বর প্রেরণ করেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ বিভিন্ন জনপদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এ ধ্বংসের নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ কোন জাতিকে রসূল প্রেরণের মাধ্যমে হেদায়েত করার ব্যবস্থার পূর্বে তাদেরকে কখনও ধ্বংস করা হয়না, যখন কোন জাতি অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, অন্যায়-অশ্লীল কাজ তাদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তারা অন্যায়-অনাচারে মেতে ওঠে, ক্ষমতার দর্পে ধন-সম্পদের দম্ভে ধরাকে সরা মনে করে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের নিকট রসূল প্রেরিত হলে তারা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করে, সত্যকে বিদ্রুপ করে, অসত্যকে আঁকড়ে ধরে, এমনি অবস্থায় যখন তাদের অন্যায়ের ঘর পূর্ণ হয় তখন তারা কোপগ্রস্ত হয়, তাদের ধ্বংস হয় অনিবার্য। এজন্যে আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ

(আমি কোন জনপদকে শুধু ঐ অবস্থায়ই ধ্বংস করি, যখন তার অধিবাসীরা জালেম হয়।)

এর দ্বারা দু'টি কথা প্রমাণিত হয়–

(১) কোন জনপদের অধিবাসীরা যে পর্যন্ত অন্যায়-অনাচার এবং জুলুম-অত্যাচারে সীমালংঘন না করে সে পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করা হয়না।

(২) কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্যে নবী রসূল বা পথ প্রদর্শক প্রেরণ না করে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়না।

يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, নবী রসূলগণ তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করেন যে যদি তোমরা ঈমান না আন তবে তোমাদের উপর আযাব আপতিত হবে।

وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ

এর অর্থ হলো, সেই জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তাঁদেরকে অবিশ্বাস করে, এভাবে নিজেদের প্রতি জুলুম করে। তারপরও

তাদেরকে অনেক অবকাশ দেয়া হয়, কিন্তু তারা সে সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করেনা, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের আযাব তাদের প্রতি আপতিত হয়।

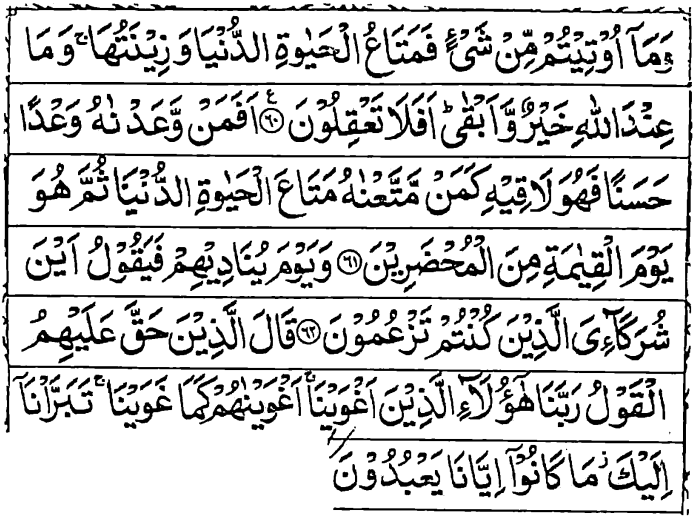

তরজমা

(৬০) আর তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা-সৌন্দর্য এবং উপভোগ্য বস্তু মাত্র, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাকের নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি করতে পার না?

(৬১) আমি যাকে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তা অবশ্যই পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্পদ দান করেছি যে এরপর কেয়ামতের দিন গ্রেফতার হয়ে আসবে।

(৬২) এবং সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, "তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়"?

(৬৩) (যাদের শাস্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই সে সব লোক যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছি, তেমনি তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছি। আমরা আপনার দরবারে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাই, তারা শুধু আমাদেরই পূজা করতো না"।

তফসীরুল কোরআন

কতিপয় কাফের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলেছিলো, আমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করি, তবে আমাদের আর্থিক ক্ষতির আশংকা রয়েছে যথেষ্ট এমনকি, মক্কাবাসী এ অবস্থায় আমাদেরকে

বাড়ী-ঘর থেকে উৎখাতও করতে পারে। কাফেরদের এ আশংকার জবাব দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আর আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ে তৃতীয় জবাব দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ

তোমরা যে ধন-সম্পদ হারানোর আশংকায় এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত রয়েছ, সে তো সামান্য কয়েক দিনের ব্যাপার মাত্র, এ নশ্বর জগতের এবং এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ধন-সম্পদ, শোভা-সৌন্দর্য নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এরপর অতি স্বাভাবিক ভাবেই যথা নিয়মে এ জীবনের অবসান ঘটবে, এখানকার ধন-সম্পদ এখানেই পড়ে থাকবে, এভাবে প্রত্যেকটি মানুষকেই পাড়ি জমাতে হয় পরপারে, অথচ যদি কোন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তি রেখে তাঁর অনুসারী হয়, তবে এমন ব্যক্তির জন্যে আখেরাতে আল্লাহ পাক যে নেয়ামত রেখেছেন তা অতি উত্তম, শুধু তাই নয়, বরং তা চিরস্থায়ী। আর ঐ উত্তম এবং চিরস্থায়ী নেয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য হীন, তুচ্ছ। অতএব, দুনিয়ার দু'দিনের জীবনের ভোগ-সম্পদের মোহে মুগ্ধ থেকে আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে ভুলে যাওয়া কোন অবস্থাতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(তবুও কি তোমরা বুঝবেনা?)

অর্থাৎ এটি নিতান্ত বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপার, স্থায়ী এবং উত্তম নেয়ামতের বদলে অস্থায়ী এবং নিকৃষ্ট সম্পদের মোহে মেতে থাকা কোন অবস্থাতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারেনা। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়াই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। এতেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য।

দুনিয়ার জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এবং ভোগ-সম্পদ যে নিকৃষ্ট একথা ঘোষণার পাশাপাশি আখেরাতের নেয়ামত যে উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা রয়েছে তা অবশেষে শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহ পাকের কাছে যা রয়েছে তা চিরস্থায়ী হবে"।

আখেরাতে আল্লাহ পাক যা রেখেছেন তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী, তাই

আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, এতদসত্বেও মানুষ দুনিয়ার সম্পদ আহরণে ব্যস্ত এবং আখেরাতের নেয়ামতের ব্যাপারে বে-খবর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো এমন, কোন ব্যক্তি যদি সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করে আনে, তখন সে দেখবে তার আঙ্গুলে যে পানি এসেছে তা সমুদ্রের তুলনায় কতখানি। এমনিভাবে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতের অবস্থা অনুরূপ। যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, আর যারা ঈমান আনে না তারা কখনও এক সমান হতে পারেনা। যে ঈমানদার তার জন্যে রয়েছে চির শান্তির কেন্দ্র-জান্নাতের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। পক্ষান্তরে, যে কাফের তার জন্যে রয়েছে দোযখের কঠোর শাস্তির মহা বিপদ। অতএব, কল্যাণকামী, বাস্তববাদী মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর অনুসরণ করে।[১]

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ

"আমি যাকে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তা অবশ্যই পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্পদ দান করেছি যে এরপর কেয়ামতের দিন গ্রেফতার হয়ে আসবে"।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ), এবনে জরীর (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে এ আয়াত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবু জেহেলের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত হযরত হামজা (রাঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল এবং মোহাম্মদ এবনে কারযীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামজা (রাঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে। অথবা হযরত আলী (রঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আর কারো কারো মতে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আম্মার (রাঃ) এবং ওলীদ এবনে মুগীরা সম্পর্কে।[২]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমান আনয়ন এবং হেদায়েত গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করা

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৪৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২০, পৃঃ ৩৯
তফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ৩৩৯
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৩৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৩৯

হয়েছে, এমনিভাবে কুফুরী ও নাফরমানীর পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে ঈমান ও হেদায়েতের সুফল কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে ঠিক তেমনি কুফরী ও নাফরমানীর শোচনীয় পরিণিতও ভোগ করতে হবে আখেরাতে। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত রয়েছে।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক তার ঈমান এবং নেক আমলের কারণে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে জীবনকে অতিবাহিত করেছে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন যাপন করেছে, উভয়ে কখনও সমান হতে পারেনা, যেমন সমান হতে পারেনা, আলো-আঁধার, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক্ব ও বাতিল।

যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় দুনিয়ার ক্ষমতা ও সম্পদ লাভের মোহে জীবন অতিবাহিত করে, আখেরাতের কথা বেমালুম ভুলে যায়, তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায় যে স্বপ্নে দেখে যে সে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছে, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে, অনেক অনুচর, অনেক পরিচারক, খাদেম-খেদমতগার তার আদেশ পালনের অপেক্ষায় রয়েছে, রকমারী সুখাদ্য এবং পানীয় তার জন্যে রেখে দেয়া আছে। তার আনন্দ-উল্লাসের সময় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না, একটু পরই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে বাস্তবে যা দেখলো তা হলো তার গ্রেফতারী পরোয়াণা নিয়ে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। এমন অবস্থায় তার স্বপ্নের রাজত্ব যেমন কোনভাবেই উপকারে আসেনা, আসতে পারেনা, ঠিক তেমনি যারা দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী আহরণে ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহ পাকের কথা ভুলে যায়, তাদের অবস্থাও ঐ স্বপ্ন দ্রষ্টার ন্যায় হয়, যখন মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে এ জীবনের অবসান ঘটে এবং মানুষটিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় দেয়া হয়, আজরাঈল (আঃ) তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তখন তার আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়জন কেউ থাকেনা, তার সারা জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ কোন কাজে লাগে না, তার অর্জিত ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তিও কোন উপকারে আসেনা। এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন,

الناس نيام فاذا ماتوا انتهبوا

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখন নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তারা জাগ্রত হবে, আর তখন আখেরাতের জিন্দেগীর নেয়ামত অথবা আযাব তাকে হাতছানি দেবে। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الدنيا مذرعة الاخرة

অর্থাৎ দুনিয়া হলো আখেরাতের কর্মক্ষেত্র, দুনিয়ার এ জীবনেই মানুষকে সম্বল সংগ্রহ করতে হয়, যে ঈমান ও নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাকওয়া-পরহেযগারীর গুণ অর্জন করে, এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার দুনিয়াতেও কোন ভয় নেই, আখেরাতেও কোন আশংকা নেই। পক্ষান্তরে, যে আসমানের নীচে জমীনের উপর অবস্থান করে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তার শাস্তি অবধারিত, তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। এজন্যে আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ

অর্থাৎ তাকে কেয়ামতের দিন গ্রেফতার করে হাযির করা হবে, আর সেদিন তাকে প্রশ্ন করা হবে।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

"এবং সেদিন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়"?

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিন কাফের-মুশরেকদেরকে ডাক দিয়ে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যাদের পূজা করতে, যে সব দেব-দেবীর সামনে মাথা নত করতে, তারা আজ কোথায়? তোমাদের এ বিপদ মুহূর্তে কেন তারা সাহায্য করতে আসেনা? ডাক তাদেরকে, বলাবাহুল্য, কেউ তখন বিপদগ্রস্ত কাফেরদের সাহায্য করতে আসবেনা, আসতে পারবেনা।

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

"(যাদের শাস্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এরাই সে সব লোক যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছি, তেমনি তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছি। আমরা আপনার দরবারে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাই, তারা শুধু আমাদেরই পূজা করতো না"।

অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে কুফরী ও নাফরমানীর আহ্বায়ক ছিল, মন্দ কাজের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতো তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছি, যেমন আমরা নিজেরাও ভুল পথে চলেছি, আমরা আমাদের এ অপরাধ স্বীকার করি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে আমরা তাদেরকে ভুল পথে চলার জন্যে বাধ্য করিনি, পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে আমরা কখনো তাদের প্রতি বল প্রয়োগ করিনি এবং তাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করিনি, আমরা তাদেরকে প্ররোচনা দিয়েছি, প্রলোভন দেখিয়েছি, তারা লোভী হয়েছে, অথচ আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাজিল করেছেন, তাদের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন, তাদের উচিত ছিল তাঁদের হেদায়েত মেনে চলা, বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে আমাদের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা

করা, তারা তা করেনি। মূলতঃ তারা আমাদের অনুসরণ করেনি, তারা অনুসরণ করেছে নিজেদের প্রবৃত্তির। তাই আজ হে পরওয়ারদেগার! কাফের মুশরেকদের কুকর্মের দায়িত্ব থেকে আমরা অব্যাহতি চাই। তাদের পূজা-পার্বনের প্রতি আমরা আপনার দরবারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন শয়তানরা এসব কথা বলবে। তফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়াতে যারা কুকর্মের হোতা হয়, তাদের এসব কথার দৃষ্টান্ত হলো, ইবলিস শয়তানের সে কথা যা সে কেয়ামতের দিন বলবে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার বিবরণঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ..... وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ (সূরা ইব্রাহীম)

"যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "নিশ্চয় আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন সত্য ওয়াদা, আর আমিও তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি, আর তোমাদের উপর আমার কোন ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিলনা, যার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজের জন্যে বাধ্য করতে পারতাম, তবে শুধু এতটুকু কথা আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজের জন্যে আহবান জানিয়েছিলাম, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ। অতএব, তোমরা আমাকে তিরষ্কার করোনা, তিরস্কার কর নিজেদেরকে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ যারা দুনিয়াতে শেরক করেছে, মূর্তিপূজা করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেনঃ যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে আমার শরীক করতে, তারা কোথায়? তখন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ শয়তানেরা এগিয়ে আসবে এবং একথা বলবে যে আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি সত্য, কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে বাধ্য করিনি, আর তাদের সাহায্যের দায়িত্ব থেকে আমরা অব্যাহতি চাই, কেননা তারা আমাদের পূজা করেনি, পূজা করেছে তাদের কুপ্রবৃত্তির।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেভাবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি এবং কেউ আমাদেরকে এজন্যে বাধ্য করেনি, ঠিক এমনিভাবে তারাও স্বেচ্ছায়ই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদেরকে কেউ এজন্যে বাধ্য করেনি।[২]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ কোরআনের করীমের অন্যত্র আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ৬২
২। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৭৯৩

"আমি অবশ্যই মানুষ ও জ্বীন দ্বারা দোযখকে পরিপূর্ণ করে দেব"।

আল্লাহ পাকের এ ওয়াদা যাদের ব্যাপারে সত্য হবে, তারাই একথা বলবে যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরেক নেতারা এবং শয়তানেরা কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে, তারা বলবে, যেভাবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি, আমাদেরকে কেউ এজন্যে বাধ্য করেনি, ঠিক তেমনি কাফের-মুশরেক-বেদ্বীন-নাস্তিক-মুরতাদ এক কথায় সকল প্রকার পথভ্রষ্ট স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই, কেননা তারা আমাদের পূজা করেনি, প্রকৃতপক্ষে তারা পূজা করেছে তাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তিরই।[১]

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ
الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৪) তাদেরকে বলা হবে তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাক, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবেনা, আর তারা আযাব দেখে ভাববে হায়! যদি তারা (দুনিয়ার জীবনে) সৎ পথের অনুসরণ করতো।

(৬৫) আর সেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে ডাকবেন, জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে?

(৬৬) এরপর সেদিন তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে, তারা একে অন্যকেও

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১০০-০১

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।

(৬৭) তবে যে (দুনিয়ার জীবনে) তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আশা করা যায় যে সে সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৬৮) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, তাতে তাদের কোন হাত নেই, আল্লাহ্ পাক পবিত্র, মহান এবং তারা যাদেরকে শরীক করে তা থেকে তাঁর শান অনেক উর্দ্ধে।

(৬৯) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

(৭০) এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই হাতে, তাঁরই হাতে রয়েছে সকল হুকুম, আর তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কেয়ামতের দিন কাফের-মুশরেকদের চরম বিপদের কথা বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতেও এমনি বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ

কেয়ামতের দিন কাফের মুশরেকদেরকে বলা হবে, তোমাদের যে দেব-দেবীকে তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক মনে করতে, তাদেরকে ডাক, কাফেররা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা সে ডাকে কোন সাড়া দেবেনা, তখন কাফের-মুশরেরকরা তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হবে। যেহেতু কোন কোন কাফের মুশরেক এ বিশ্বাস করতো যে বিপদ মুহূর্তে তাদের দেব-দেবীরা উপকারী হবে, তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সেদিন, তাই তাদের নিরাশা বেড়ে যাবে এবং তারা অধিকতর অসহায় হয়ে পড়বে। অন্যদিকে তাদের অন্তর্জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ

তারা যখন নিজেদের এবং তাদের বাতিল উপস্যাদের জন্যে নির্দিষ্ট আযাব দেখবে, তখন তারা আরো বিপদগ্রস্ত হবে। কেননা যাদের সম্পর্কে তাদের আশা ছিল যে তারা হবে সাহায্যকারী, তারা শুধু যে কোন সাহায্য করতে পারছে না তাই নয়, বরং তারা নিজেরাই বিপদগ্রস্ত, তাদের পূজারীদের সাহায্য করার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

এমনি অবস্থায় তাদের অসহায়ত্ব কত বেশী হবে তা বর্ণনাতীত। আর সে সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে, যদি তারা দুনিয়াতে হেদায়েত গ্রহণ করতো তবে আজ এমনি মহাবিপদের সম্মুখীন হতো না।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ

"আর সেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে ডাকবেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে"?

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন কাফেরদেরকে বলা হবে যে নবী রসূলগণ যখন তোমাদের নিকট হেদায়েতের বাণী নিয়ে পৌঁছেছিলেন, তখন তোমরা নবী রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে?

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এমনি জিজ্ঞাসার উল্লেখ রয়েছে। আর সে জিজ্ঞাসা ছিল তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে, আর এ আয়াতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নবুওয়্যত ও রেসালত সম্পর্কে, কাফের-মুশরেকদের উদ্দেশেই ছিল এ জিজ্ঞাসা, কেননা প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ পাকের বাণী মানব জাতিকে পৌঁছিয়েছেন, তখন তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে? যদি মানুষ নিজে কোন সত্য উপলব্ধি করতে না পারে, তবে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, এটিই সাধারণ নিয়ম, এমন অবস্থায় তোমরা নবী রসূলগণের মাধ্যমে কেন সৎ পথ গ্রহণ করলে না? কেন তাদের নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করলে না? তখন তারা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হয়ে যাবে, তাদের মুখে টু শব্দটিও থাকবে না।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলোঃ তাদের নিকট তাদের স্বপক্ষে পেশ করার মত কোন বক্তব্যই থাকবে না।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন নবী রসূলগণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ভয়ে কম্পমান থাকবেন, আল্লাহ পাক কোন প্রশ্ন করলে বলবেন, হে আল্লাহ! তুমিই জান যে আমরা শেরকের আদেশ দেইনি, সে ভয়াবহ মুহূর্তে কাফেরদের মুখ খোলার কথা চিন্তাও করা যায়না, এজন্যেই আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ

সেদিন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবেনা। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশ্নের উত্তর দেয়া কি করে সম্ভব হবে? এতদ্ব্যতীত যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে নিজেও তো নিরুত্তরই থাকবে।[১]

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

"তবে যে (দুনিয়ার জীবনে) তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আশা করা যায় যে সে সফলকাম লোকদের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

সাফল্য কোন্ পথে?

অর্থাৎ যে শেরক ও কুফরী থেকে তওবা করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, আর এ ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল করে, আশা করা যায় যে সে সফলকাম হবে, কেননা যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, তার একান্ত কর্তব্য হলো

আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা, এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে জীবনের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাককে ভয় করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

বলাবাহুল্য, এসবই হলো সৎ কাজ, আর এটিই হলো জীবন-সাধনায় সাফল্য লাভের সুনিশ্চিত পন্থা। পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে এ পথেরই নির্দেশনা দিয়েছে এবং যারা এ পথ অবলম্বন করবে, তাদের সাফল্যের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ

"আশা করা যায় যে সে সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

অর্থাৎ তাদের আশা করা উচিৎ যে, তাদের সাফল্য অর্জিত হবে। এটিই হলো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালামের বিশেষ ধরণ যে তিনি বন্দাকে তাঁর রহমতের আশায় আশান্বিত করেন, আর যাকে তিনি আশান্বিত করেন, তার আশা তিনি পূর্ণও করেন, কেননা তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, তাতে তাদের কোন হাত নেই, আল্লাহ্ পাক পবিত্র ও মহান এবং তারা যাদেরকে শরীক করে তা থেকে তাঁর শান অনেক উর্দ্ধে"।

তৌহীদের ঘোষণা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যখ্যায় লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ পাক, সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই, তাঁর কোন শরীর নেই, তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। আর তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা হয়না-হতে পারে না। সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, সৃষ্টি এবং ক্ষমতা সবই এক আল্লাহ্ পাকের হাতে, এতে কেউ শরীক নেই এবং তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। আল্লাহ্ পাক মহান, কাফের–মুশরেকরা তাঁর সাথে যে শেরক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্দ্ধে। তিনি এক, তাঁর যেমন কোন শরীক নেই, তেমনি তাঁর কোন দৃষ্টান্তও নেই, সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই, ঠিক তেমনি প্রতিটি সৃষ্টির অদৃষ্ট নির্দিষ্ট করণেও কারো কোন এখতিয়ার নেই। তাই কাফের–মুশরেকরা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র।[১]

আলোচ্য আয়াতের يختار শব্দটির ব্যখ্যায় তফসীকারগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২০, পৃঃ ৪১

আল্লাহ পাক যাকে পছন্দ করেন, তাকেই তিনি তাঁর নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করেন, যেমন পৃথিবীর সব লোককে বাদ দিয়ে সর্বশেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মক্কার কাফেররা বলেছিল যে কোরআন মক্কা মদীনা এ দু' শহরের কোন স্বচ্ছল লোকের প্রতি কেন নাজিল হলোনা? যেমন ওয়ালিদ এবনে মুগীরা এবং ওরওয়া এবনে মাসউদ মক্কীর মত লোকদের প্রতি কেন নাজিল হলোনা? তাদের এমন আপত্তিকর উক্তির জবাবেই আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাজিল করেছেনঃ

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

"তাতে তাদের কোন হাত নেই"।

অর্থাৎ বন্দাদের একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, অমুককে কেন পয়গম্বর মনোনীত করা হলো? আর অমুককে কেন মনোনীত করা হলোনা?

মূলতঃ বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর নবী মনোনীত করেন। যেহেতু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং আল্লাহ পাকের নিকট তিনি সর্বাধিক প্রিয়, তিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, তিনি সর্বপ্রথম নবী অর্থাৎ নবুওয়্যত তাঁর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমেই শেষ হয়েছে, তাই তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, অন্য নবীগণের নবুওয়্যত বিশেষ যুগ এবং অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত একদিকে সারা পৃথিবীর জন্যে, অন্যদিকে সর্বকালের জন্যে অর্থাৎ তাঁর নবুওয়্যত বিশেষ কোন স্থান ও কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; বরং যতদিন এ পৃথিবী আছে, ততদিন তাঁর নবুওয়্যতও থাকবে এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হতে থাকবে। এটি আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা, এর বরখেলাফ হয়নি, কখনও হবেনা।

অতএব, কোন কোন দূরাত্মা কাফেরের এমন মন্তব্য যে তাঁকে কেন নবুওয়্যত দেয়া হলো তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অমূলক এবং অমার্জনীয় অপরাধ।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

"আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে"।

আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি অর্ন্তযামী। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব কথা গোপন থাকে, সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াফেকহাল, এমনকি ভবিষ্যতে মানুষ কি চিন্তা করবে, তা-ও আল্লাহ পাক জানেন। সূরায়ে ক্বাফে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

"আর নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, মানুষের মনে নিভৃত কোণে কি সব ভাবনার অবতারণা হয় তা-ও আমি জানি"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কাফেরদের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক পুরোপুরি অবগত এবং তাদের শাস্তি বিধানে সম্পূর্ণ সক্ষম।[১]

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ

"এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই"।

বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ পাকই, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে একমাত্র তাঁরই কতৃত্ব, আধিপত্য এবং প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি লা-শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই, কেননা দাতা শুধু তিনিই, আর কেউ নয়, তিনি সব কিছুর মালিক, অতএব, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর কারো নয়। তাই এবাদত-বন্দেগী হবে শুধু তাঁরই জন্যে এবং এটি তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর পবিত্র সত্তাই এমন, যাঁর নিকট মানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্যে আরজী পেশ করতে পারে, তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র আশা-আকাংক্ষার স্থল, সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত ও প্রাণবন্ত।

وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"তাঁরই হাতে রয়েছে সকল হুকুম, আর তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে"।

অর্থাৎ তাঁর আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলো নেককারদের জন্যে মাগফেরাতের হুকুম জারী হবে, পক্ষান্তরে অবাধ্য কাফের, নাস্তিক, মুরতাদদের জন্যে তাঁর শাস্তির আদেশ কার্যকর হবে। আর তোমাদের প্রত্যেককে অবশেষে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। যার জন্যে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সময় অবশ্যই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে যথা সময়ে হাযির হতে হবে এবং প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। নেক আমলের জন্যে পুরস্কার রয়েছে এবং বদ আমলের জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তবে আল্লাহ পাক পরম করুণাময়, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন, এটি তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। অবশ্য এ সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৩৮-৩৯

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক শেরক মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন"।

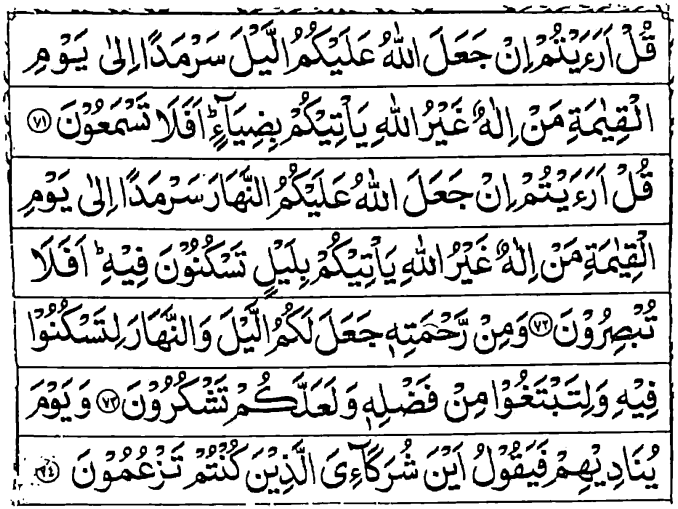

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৭১) (হে রসূল!) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন পর্যন্ত রাত্রিকে তোমাদের উপর অনবরত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন মা'বুদ রয়েছে কি যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে?

(৭২) (হে রসূল!) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে অনবরত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্যে রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবেনা?

(৭৩) আল্লাহ পাকই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্যে রাত দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর দান অন্বেষণ করতে পার, আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(৭৪) আর যেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করবেন এবং বলবেন, "তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়"?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ

(দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।)

অর্থাৎ প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্যে, এর কারণ হলো মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব, এ পৃথিবী ও পৃথিবীর সব কিছু এক আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি এবং তাঁরই দান, এক কথায় সমস্ত নেয়ামত এক আল্লাহ পাকেরই, তাই সমস্ত প্রশংসাও এক আল্লাহ পাকেরই।

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের এমন কিছু নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সর্বক্ষণ ভোগ করে এবং যে নেয়ামত ব্যতীত মানুষের কোন গত্যন্তর নেই, আর যে নেয়ামত আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ .....

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত অনবরত রাত রেখে দেন, কখনো সূর্যকে উদিত হতে না দেন, অথবা তার আলো নিস্প্রভ করে দেন, এমন অবস্থায় অন্য কোন শক্তি আছে কি তোমাদের জন্যে দিন এনে দিতে পারে? তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে পারে? তবুও কি তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের প্রতি কর্ণপাত করবে না? আল্লাহ পাক যাকে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কথা কি তোমরা শ্রবণ করবে না?

এমনিভাবে আল্লাহ পাক যদি কেয়ামত পর্যন্ত অনবরত দিনকে স্থায়ী করেন, এমন অবস্থায় তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত্রিকে এনে দিতে পারে, এমন কোন শক্তি আছে কি?

বলাবাহুল্য, এমন কোন শক্তি নেই যে রাতের স্থলে দিনকে, দিনের স্থলে রাতকে আনতে পারে, এটি শুধু এক আল্লাহ পাকেরই কুদরত, যিনি সময়কে দিন এবং রাতে ভাগ করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান যে তিনি মানুষকে কর্মের জন্যে দিন দিয়েছেন এবং কর্মক্লান্ত মানুষের বিশ্রামের জন্যে রাত দিয়েছেন। অতএব, রাত এবং দিনের এ ব্যবস্থা মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের দান। যারা কাফের-মুশরেক, যারা নাস্তিক বা মুরতাদ তাদের এসব বিষয় ভেবে দেখা দরকার, যারা জাগতিক শক্তিকেই শক্তি মনে করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তিতে বিশ্বাস করেনা, তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত এবং তাদের বাস্তববাদী হয়ে বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত যে পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর নিজের করুণায়ই মানুষের জীবিকা উপার্জনের জন্যে দিন এবং বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে রাতের ব্যবস্থা করেছেন। এটি আল্লাহ পাকের কত বড় নেয়ামত তা বর্ণনাতীত।

মানুষের জীবন যাপনের জন্যে, জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে কর্মের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, আর কর্মের পর বিশ্রামও অপরিহার্য। তাই আল্লাহ পাক দয়া করে মানুষের জন্যে দিন রাতের এ সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের سرمدا শব্দটির অর্থ হলো সর্বদা। ইমাম কাতাদা (রঃ)-ও একথাই বলেছেন অর্থাৎ যদি সর্বদা আল্লাহ পাকের হুকুমে

রাত থাকে, তবে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর, সেই দেব-দেবী বা বাতিল উপাস্যরা কি রাতের স্থলে দিন এনে দিতে পারবে?

অথবা আল্লাহ পাক যদি কেয়ামত পর্যন্ত দিনই বহাল রাখেন, সূর্যকে অস্তমিত হওয়ার আদেশ না দেন, তবে কি বাতিল প্রভুরা সে স্থলে রাত এনে দিতে পারবে? তা যে কারো পক্ষেই সম্ভব হবেনা, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।[১]

অন্য দৃষ্টিতেও বিষয়টির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক উন্নতির যে বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত এ যুগে স্থাপিত হয়েছে তা সত্যিই ইতিপূর্বে ছিল কল্পনাতীত, যে কারণে এ যুগে অনেক নাস্তিক ও মুরতাদ সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো যদি আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করেন, বিজ্ঞান কি সে স্থলে দিন এনে দিতে পারবে? অথবা আল্লাহ পাক যদি সর্বদা দিনই রেখে দেন, তবে কি বিজ্ঞান সে স্থলে মানব জাতির বিশ্রামের প্রয়োজনে রাত এনে দিতে পারবে? জবাব একটিই আর তা হলো 'না'।

অতএব, বুদ্ধিমানের কাজ হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসারী হওয়া এবং আল্লাহ পাকের মহান বাণী বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলা।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্যে রাত দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর দান অন্বেষণ করতে পারে। আর তোমরা যেন (আল্লাহ পাকের দান সমূহের জন্যে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই তাঁর দয়ায় তোমাদের প্রয়োজনে দিন ও রাতের এ ব্যবস্থা করেছেন। দিনে যেন তোমরা তোমাদের জীবিকা উপার্জন করতে পার, আর রাতে যেন তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার। বস্তুতঃ এটি আল্লাহ পাকের বিরাট নেয়ামত যে মানুষ যত ক্লান্তই থাকুক না কেন, রাতের নিদ্রার পর গতকালের ন্যায় তার ক্লান্তিও গত হয়ে যায়।

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

আর যেন তোমরা আল্লাহর দানের অন্বেষণ করতে পার তথা জীবিকা উপার্জন করতে পার।

জীবিকা উপার্জনের এ সুযোগকে আল্লাহ পাকের দান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ৬৫-৬৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৪, পৃঃ ১৪৭-৪৮

ইসলামে জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইসলামের দৃষ্টিতে জীবিকা উপার্জনের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জীবিকা উপার্জনের জন্যে কোন পেশা গ্রহণ করা বা চেষ্টা-তদবির করা আদৌ নিন্দনীয় নয়, বরং অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা একথা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবিকা উপার্জনের জন্যে পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয়, কেননা তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করা, তিনি অবশ্যই দান করবেন, কেননা তিনি মহান দাতা, অন্তরে একথার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা আর সে দান লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া আদৌ তাওয়াক্কুলের বরখেলাফ নয়। কেননা কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছেঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"যখন নামাজ সুসম্পন্ন হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্ পাকের দান অন্বেষণ কর, আর আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।

আলোচ্য আয়াতে জীবিকা উপার্জনের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[১]

এতদ্ব্যতীত, হাদীস শরীফেও এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলিম জাতিকে একটি পরিশ্রমী জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

"ফরজ এবাদতের পর হালাল রুজির অন্বেষণ করাও ফরজ তথা একান্ত কর্তব্য"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

اذا صليتم الفجر فلا تنوموا عن طلب أرزاقكم

"যখন তোমরা ফজরের নামাজ সুসম্পন্ন কর, তখন হালাল রুজির অন্বেষণের স্থলে ঘুমিয়ে পড়োনা তথা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়োনা"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আরও তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১০৯
তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৭৯৪

ان الله يحب ان يرى العبد محترفا

"নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাকে কোন পেশায় রত অবস্থায় দেখতে পছন্দ করেন"।

এমনিভাবে হালাল রুজীর অন্বেষণে পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করে তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ

اجملوا فى طلب الدنيا فان كل ميسر لما خلق

"তোমরা এ জীবনের প্রয়োজনে জগতের সম্পদ আহরণে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর, মনে রেখ, যাকে যে জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার সে কাজ সহজ করা হয়"।

من فروض الكفاية الحرف والصابع وما تتم به المعاش

"কর্মের মাধ্যমে রুজীর অন্বেষণ করা ফরজে কেফায়া"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

من الذنوب لا يكفرها الا الهم فى طلب المعونه

কতকগুলো এমন গুনাহ্ মানুষ করে থাকে, যার কাফ্ফারা হলো শুধু অর্থ-সম্পদ আহরণে মানুষের যে কষ্ট হয় তা দ্বারা অর্থাৎ মানুষ যে কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা করে, তথা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার আহার্য আহরণ করে, এর ফলে আল্লাহ্ পাক তার অনেক গুনাহ্ মাফ করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

باب الرزق مفتوح الى باب العرش

রিয্ক বা উপজীবিকার দ্বার আরশের দ্বার পর্যন্ত উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব মানুষ যেন এ পর্যায়ে একটু অসাফল্যের সম্মুখীন হলেই হতাশ না হয়, বরং এক পথ বন্ধ হলে আল্লাহ্ পাক খুলে দেন তার জন্যে অন্য পথ। আর তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে বিশেষ নির্দেশ জারি করে এরশাদ করেছেনঃ

لا يقعد احدكم من طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة

"তোমাদের মধ্যে কারো উচিত নয় যে সে তার হালাল রুজীর অন্বেষণ না করে বসে থাকবে আর আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করবেঃ এলাহী! আমাকে রিয্ক দান কর। তোমরা একথা নিশ্চিতভাবে জান যে, আসমান স্বর্ণ রৌপ্য বর্ষণ করেনা"।

অর্থাৎ এ জগতের সম্পদ অর্জন করতে হলে মানুষকে এ জগতের বুকেই পরিশ্রম করতে হবে। মানুষের উপজীবিকা হিসেবে যা কিছুর প্রয়োজন, এসবের মহা আয়োজন আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির পূর্বেই করে রেখেছেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

হালাল রুজীর অন্বেষণে মেহনত করতে আদেশ দিয়ে এরশাদ করেছেঃ

افضل الاعمال الكسب الحلال

"উত্তম কাজ হলো হালাল রুজীর অন্বেষণ করা"।

তিনি এ সম্পর্কে আরও এরশাদ করেছেনঃ

طلب الحلال مثل مقارعته الا بطال فى سبيل الله ومن بات تعبا من طلب الحلال بات الله عنه راض

অর্থাৎ হালাল রুজীর অন্বেষণে পরিশ্রম করার দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যেমন আল্লাহর রাহে জেহাদ করা তথা বীর পুরুষদের সাথে বীর বিক্রমে লড়াই করা, আর যে হালাল রুজীর অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার পর ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

"আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করবেন এবং বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়"?

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে এবং যারা তোমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করবে বলে ধারণা করতে তারা আজ কোথায়?

তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু শেরক হলো আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির বড় কারণ, তাই কাফেরদেরকে এভাবে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, আর সেদিন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে শেরক ছিল তাদের অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের সম্মুখে কাফেররা মাথা নত করতো সেদিন তাদের কারোই অস্তিত্ব থাকবে না। সেদিন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, কিন্তু এ উপলব্ধি তাদের কোন কাজে আসবে না, তাদের শাস্তি হবে অবধারিত।

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾
إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ
مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ
إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৭৫) প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব; এরপর বলব তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর, তখন তারা জানতে পারবে যে উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এবং তারা যা নিজেরা তৈরী করতো সবই হারিয়ে যাবে।

(৭৬) নিশ্চয় কারুণ ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, এরপর সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল, আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দিয়েছিলাম যে কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবকও তার চাবি বহন করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তার জাতি তখন তাকে বলে, দম্ভ করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক দাম্ভিক লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

(৭৭) আল্লাহ পাক যা তোমাকে দান করেছেন, তা দ্বারা আখেরাতের সাফল্য কামনা কর, আর দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেওনা। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের উপকার কর। আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

"আর প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব"।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী বের করবেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকেই কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে হাযির করবেন। এরপর কাফেরদেরকে বলবেন, তোমরা যে শেরক ও কুফরী করতে তার পক্ষে কোন দলিল থাকলে পেশ কর, কিন্তু তারা কোন প্রকার দলিল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে না।

فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ

(তখন তারা জানতে পারবে যে আল্লাহ্ পাকের কথাই সত্য।)

বাক্যটির আরো একটি অর্থ হতে পারে, মা'বুদ বা উপাস্য হওয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহ্ পাকেরই, আর কারো নয়, আর তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই পরাক্রমশালী, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁরই, তাঁর আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

কাফের-মুশরেক, নাস্তিক-মুরতাদরা স্রষ্টা ও পালনকর্তা সম্পর্কে পৃথিবীতে যা কিছু বলে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অমূলক এবং জঘন্য অপরাধ।

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথ সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে আল্লাহ্ পাক ফেরাউনের দম্ভ এবং অশান্তি সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর সূরার শেষ পর্যায়ে আরেক অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারী কারুণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফেরাউনের ন্যায় কারুণও ছিল দাম্ভিক এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী, ফেরাউনকে দান করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে কারণে তার অহংকারের অন্ত ছিলো না। আর কারুণের কাছে ছিল অগাধ ধন-সম্পদ যে কারণে সে-ও অহংকার করেছিল, আর অহংকার যখন কারো চরিত্রে প্রবেশ করে তখন সে অশান্তি, উপদ্রব এবং উৎপাত আরম্ভ করে, সমাজ ও জাতির জন্যে সে ডেকে আনে বিপদ, এজন্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করার আহবান জানায় পবিত্র কোরআন, আর এ প্রসঙ্গেই কারুণের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাঁর একান্ত রহমতে তোমাদের জন্যে দিন রাতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কারুণ যেভাবে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিল, তোমরা এমনটি করোনা। অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনি দুনিয়ার আসবাবপত্রও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব, কোন বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার এ অবস্থা লক্ষ্য করে দুনিয়ার ভোগ-সম্পদে মুগ্ধ থাকতে পারেনা, কেননা যে কোন সময় দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। আর আলোচ্য আয়াতে কারুণের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কেউ যেন কারুণের ন্যায় ভোগবাদের মরফিয়া পান করে নিজেকে ধ্বংস না করে।

অথবা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। যেভাবে ফেরাউনের ঘটনা হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি কারুণের ঘটনাও হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির মোজেযার ন্যায় এ মোজেযাটিও প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে হযরত মুসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূল, আর তাঁর মোকাবেলা ছিল ফেরাউন এবং কারুণের সঙ্গে। ফেরাউন ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, আর কারুণ ছিল অঢেল অর্থ-সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা স্বরূপ ইতিহাসের দু'জন অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ধ্বংস করে দেন। ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয় এবং কারুণকে তার ধন-সম্পদ সহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া হযরত মুসা (আঃ)-এর সামুদ্রিক মোজেযা ছিল, আর কারুণের ধ্বংস হওয়া ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর স্থলভাগের মোজেযা। ফেরাউন তার ক্ষমতার দর্পে হেদায়েতের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর কারুণ তার অগাধ সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে হেদায়েতকে উপেক্ষা করেছিল, অবশেষে বিশ্ববাসী দেখেছে ক্ষমতা, আধিপত্য বা অর্থ-সম্পদ কোনটিই কাজে লাগেনা, এসবই নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। মানুষের জীবন আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত, এ নেয়ামতের শোকর গুজারী হয় আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। আর এ সার্থকতা লাভের জন্যে নবী রসূলগণের অনুসরণ পূর্বশর্ত। যারা এতে অবহেলা করে অথবা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ধ্বংস হয় অনিবার্য। যেমন ফেরাউন একং নমরুদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্ব মানবের জন্যে এক মহান শিক্ষা।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ

"নিশ্চয় কারুণ ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত"।

কারুণের পরিচিতি

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই ছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান, আর কারুণের পিতা ছিল ইয়াসহার। তারা উভয়ে কাহাত এবনে লাদী এবনে ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন।

এবনে জোরায়েযের এ বর্ণনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবনুল মুনজের।

এবনে এসহাক লিখেছেন, কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-এর চাচা এবং এমরানের ভাই ছিল। কারুণ এবং এমরান উভয়ে ইয়াসহার এবনে কাহাতের পুত্র ছিল।

কারুণ অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে তৌরাত পাঠ করতো। সে যুগে কারুণের চেয়ে তৌরাতের উত্তম পাঠক আর কেউ ছিল না। তবে সামেরীর ন্যায় কারুণও মুনাফেক ছিল।

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (রঃ) লিখেছেন, কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-এর চাচার পুত্র ছিল আর মাতা ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর খালা।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুর্নীতি পরায়ণ, জালেম এবং মুনাফেক ছিল। ফেরাউন তাকে বণী ইসরাঈলের উপর জুলুম করার উদ্দেশে দালাল হিসাবে নির্বাচন করে। হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকটাত্মীয় হওয়া সত্বেও কারুণ ফেরাউনের দরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কারুণ ছিল ফেরাউনের দরবারের পেশকার। দারুণ অর্থলোভী। সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তার অর্থ-ভান্ডার দিনে দিনে পরিপুষ্ট হতে থাকে। এজন্যে তার দম্ভও বেড়ে যায়।

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

উপরোল্লিখিত কারণে কারুণ বণী ইসরাঈলের উপর জুলুম-অত্যাচার করতে থাকে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কারুণ শেরক করে তার জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো কারুণ বণী ইসরাঈলের সম্মুখে অহংকার করতে থাকে, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কারুণ বণী ইসরাঈলীদের প্রতি হিংসা করতে থাকে এবং সকলের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবার আকাংক্ষা করতে লাগলো।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে আবি হাতেম ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে কারুণ ছিল মুসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই। বণী ইসরাঈল যখন ফেরাউনের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে লোহিত সাগর পাড়ি দেয়, তখন কারুণও তাদের সঙ্গী হয়ে পার হয়ে যায়, অথচ ফেরাউন তখন ডুবে মরে। এ ঘটনার কারণে কারুণের অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয় এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কারুণ ছিল অত্যন্ত চতুর। ঐ বিপদ মুহূর্তে হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরোধিতা বর্জন করে নিজেকে তাঁর অনুগত বলে পরিচয় দেয়, তৌরাত পাঠে সে ছিল দক্ষ, তাই সে তৌরাত পাঠ করতে থাকে এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এতদসত্বেও সে হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করতে থাকে। কখনও তার মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে লালিত এ হিংসার প্রকাশও হতে থাকে। সে মানুষকে বলতো, আমি মুসার আপন ভাই না হলেও, চাচাত ভাইতো অবশ্যই, এমন অবস্থায় মুসার সাথে হারুণ নবী হলেন, অথচ আমি চাচাত ভাই হয়েও বঞ্চিত হলাম।

শহর এবনে হাওসাব বলেছেন, অহংকার প্রকাশের জন্যে কারুণ তার পোশাককে কমপক্ষে এক বিঘত লম্বা করতো, আর তা টেনে টেনে হাটতো।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৪১

অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার পোশাক অহংকারের কারণে টেনে টেনে চলে, আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (বগভী)

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দম্ভ অহমিকার কারণে তার চাদর টানে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

ইমাম আহমদ এবং নেসায়ী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এমনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ

"আমি তাকে এত ধন ভান্ডার দিয়েছিলাম যে কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবকও তার চাবি বহন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তো"।

কারুণের সম্পদের বিবরণ

আলোচ্য আয়াতে كنوز শব্দটির অর্থ হলো সঞ্চিত সম্পদ, আর مفاتح এর অর্থ হলো অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত সিন্দুকের চাবি।

কাতাদা এবং মুজাহেদ (রঃ) সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, مفاتح অর্থ ধন-ভান্ডার। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ইঞ্জিলে রয়েছে কারুণের সিন্দুকের চাবিগুলো ষাটটি খচ্চরের বোঝা হতো, আর চাবিগুলো এক আঙ্গুলের চেয়ে বড় হতো না। আর প্রত্যেক ধন-ভান্ডারের জন্যে একটি করে চাবি ব্যবহৃত হতো। চাবিগুলো লৌহ নির্মিত ছিল। কারুণ যখন কোন দিকে যেত তখন চাবিগুলো তার সঙ্গে থাকত।

পূর্বোল্লিখিত বিবরণটি ইঞ্জিলে রয়েছে, কিন্তু কোরআনে করীমে এ স্থলে العصبة শব্দটি বব্যহৃত হয়েছে। এ শব্দটি যুবকদের একটি দলকে বলা হয়, খচ্চরের দলকে বলা হয়না। প্রশ্ন হলো, এ শব্দটি কতজন লোকের দলকে বলা হয়? আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামগণ একাধিক মত পোষণ করেন। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, দশ থেকে পনেরো জনের দলকে 'আসাবা' বলা হয়।

আর তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিন থেকে দশজন পর্যন্ত লোককে 'আসাবা' বলা হয়। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, দশ থেকে চল্লিশ জনের দলকে 'আসাবা' বলা হয়। বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসেও একথা বলা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ৭০ জনের দলকে 'আসাবা' বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথাও

বর্ণিত আছে, চল্লিশ জন শক্তিশালী ব্যক্তি কারুণের চাবি বহন করতো। আর যখন তারা এ বোঝা বহন করতো, তখন তাদের মাথা ঝুঁকে যেত।[১]

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

"কারুণের অন্যায়-অনাচার যখন বেড়ে গেল, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, তুমি দম্ভ করোনা, আল্লাহ পাক দাম্ভিক লোকদেরকে পছন্দ করেন না"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, فرح এর আভিধাণিক অর্থ হলো, কোন ভোগ্য বস্তু পেয়ে আনন্দিত হওয়া, যখন মানুষ এমন কিছু পায় যা অন্যের কাছে থাকে না তখন সে অহংকার করে, এ অহংকার নিষিদ্ধ। এজন্যে এর অনুবাদ করা হয়েছে, দম্ভ করোনা, অহংকারী হয়োনা। কোন উদ্দেশ্য সফল হলে বা কোন দুর্লভ বস্তু লাভ হলে আনন্দিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, বরং এটি মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার, কিন্তু লব্ধ বস্তুর জন্যে অহংকারী হওয়া নিতান্ত অন্যায়।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, দুনিয়ার কোন সম্পদ লাভ হলে আনন্দিত হওয়াও সঠিক নয়, তাতে অহংকার থাকুক বা না থাকুক। কেননা দুনিয়ার সম্পদ পছন্দ করা বা তা লাভ করার মধ্যে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, দুনিয়া যে অবশেষে শেষ হয়ে যাবে, এ বিষয়ের প্রতি গাফলত রয়েছে, আর এ গাফলত নিতান্ত অপছন্দনীয় কাজ। এজন্যে ইসলাম দুনিয়া গ্রহণে আপত্তি করেনা, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আসক্তিতে আপত্তি জানায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

অর্থাৎ দুনিয়ার যা কিছু হারিয়েছে তার জন্যে দুঃখ করোনা।

لَا تَفْرَحْ

অর্থাৎ দম্ভ প্রকাশ করোনা, এর কারণ এই, যারা অহংকার করে আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। যারা দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে, এমনকি আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে অহংকার করে, আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, কেননা নেয়ামত দাতার শোকর আদায় করাই ছিল গ্রহীতার কর্তব্য, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনয় প্রকাশ করারই ছিল একান্ত করণীয় কাজ। কিন্তু যারা তার স্থলে অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করে, সে ব্যক্তি সবর অবলম্বনকারী রোযাদারের ন্যায়।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১১০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৫, পৃঃ ৩৩৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৪৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৩৬-৩৭

"আল্লাহ পাক যা তোমাকে দান করেছেন, তা দ্বারা আখেরাতের সাফল্য কামনা কর, অর দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেওনা"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়ার যে নেয়ামত দান করেছেন তা দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য কামনা করাই কর্তব্য, কেননা দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতেই কর্মের সুযোগ রয়েছে, আখেরাতে শুধু কর্মফল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মানুষ দুনিয়ার জীবনের কোন হক্ব আদায় করবেনা, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَنْسَ

অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেওনা। এর অন্য একটি অর্থ হতে পারে। দুনিয়াতে তোমার যা কিছু আছে তা আখেরাতে নিয়ে যেতে ভুলে যেওনা, কেননা দুনিয়াতে আল্লাহর রাহে দান করা এবং আখেরাতে তার শুভ পরিণতি লাভ করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

দুনিয়াতে যা তোমার প্রয়োজন তার আয়োজন কর, আর অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাহে দান কর। এভাবে তুমি আখেরাতের সাফল্য লাভে সচেষ্ট হও, কেননা মানুষ দুনিয়া থেকে আখেরাতের জন্যে যা প্রেরণ করবে তাই সে লাভ করবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী

نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুনিয়াতে মানুষের অংশ হলো শুধু তার কাফন, কেননা কাফন ব্যতীত আর কিছুই মানুষ দুনিয়া থেকে নিতে পারেনা। তাই প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হলো এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুনিয়ার জীবন যাপন করা এবং অর্থ-সম্পদ অর্জিত হলেও দম্ভ করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। এজন্যেই কবি বলেছেন,

نصيبك مما تجمع الدهر كله * رداء ان تلوى فيهما وحنوط

(দুনিয়াতে সারা জীবন যা তুমি রোজগার কর, তা থেকে তোমাকে শুধু দু'টি চাদর আর একটু সুগন্ধি দেয়া হবে।)

اگر ملك تو شام تا يمن خواهد بود
ازسر حد روم تا ختن خواهد بود
اتنرور كزين جهان بها عزم سفر
همراه تو چند گز كفن خواهد بود

অর্থাৎ যদি তুমি সিরিয়া থেকে ইয়ামন পর্যন্ত এমনকি, রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত স্থানের অধিকারী হও, কিন্তু যে দিন তুমি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, সেদিন তোমার

সঙ্গে কয়েক গজ কাফনের কাপড় ব্যতীত আর কিছুই যাবেনা, অতএব অর্থ-সম্পদ অর্জিত হলে তাকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করা এবং তাঁর দরবারে শোকর আদায় করা এবং বিনয়ী হওয়া কতর্ব্য। আর একটি কর্তব্য হলো, এ অর্থ-সম্পদ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

(আর মানুষের প্রতি এহসান কর, যেমন আল্লাহ পাক তোমার প্রতি এহসান করেছেন।)

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে জুলুম-অত্যাচার করোনা, কেননা জুলুম-অত্যাচারের কারণেই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যে আল্লাহর নাফরমানী করে সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, কেননা পাপাচারের পরিণতিই হলো অশান্তি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়ার নেয়ামত দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য কামনা করা হলো মর্দে মোমেনের কাজ।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, 'দুনিয়াতে তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা ভুলে যেওনা'-কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহর রাহে দান করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ হলো, নিজের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন এবং অর্থ-সম্পদকে আখেরাতের জিন্দেগীর জন্যে ব্যয় করতে ভুলে যেওনা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পাঁচটি জিনিসকে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ মনে কর (১) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, (২) অসুস্থতার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, (৩) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে (৪) বৃদ্ধকাল আসার পূর্বে যৌবনকে, (৫) আর দারিদ্র আসার পূর্বে অর্থ-সম্পদকে। (হাকেম, বায়হাকী)

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে তা আল্লাহর রাহে দান কর।

আর মনসুর এবনে যাজান বলেছেন, দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেওনা, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি ব্যয় করাকে ভুলে যেওনা।[১]

বস্তুতঃ মানুষের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, সে তার নিজের সম্পর্কে ভুল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শুধু তাই নয়, বরং ঐ মুহূর্তে সে কারো হিতোপদেশও গ্রহণ করেনা, নিজের কল্যাণকেও তার দৃষ্টিতে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৪৫

অকল্যাণকর মনে হয়। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল কারুণের। তার সম্প্রদায় তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, স্বয়ং হযরত মুসা (আঃ) তাকে বারে বারে সরল সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করেছেন, কিন্তু তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি, তিনি তাকে বলেছেন, ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের দান, এ দানের জন্যে তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ধন-সম্পদ নিয়ে কখনও গর্ব করোনা, যারা গর্ব বা অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন, তা ভোগ করতে কেউ তোমাকে নিষেধ করেনা, কিন্তু তোমার করণীয় হলো, তোমার প্রয়োজন পূরণের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহর রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বিতরণ করতে থাক। এর ফলে তুমি আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের দিকে তুমি অধিকতর মনযোগ দাও। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, ঠিক তেমনি তোমারও কর্তব্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের দুঃখ নিবারণ করা, এতদ্ব্যতীত অর্থ-সম্পদ আছে বলেই তার দ্বারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না, আর একথা সর্বজন-বিদিত যে আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারাই হয় অভিশপ্ত, তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত, তারাই হয় কোপগ্রস্ত যেমন কারুণ হয়েছিল।

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ
أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ
جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ ۙ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ۚ
وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾

তরজমা

(৭৮) কারুণ বললো, এ সম্পদ তো আমি আমার জ্ঞান বলে অর্জন করেছি, সে কি জানেনা যে আল্লাহ পাক তার পূর্বে এমন বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার চেয়ে অধিকতর শক্তি এবং সম্পদের অধিকারী ছিল। আর পাপীষ্ঠ লোকদেরকে তাদের

পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবেনা।

(৭৯) এরপর সে তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে হাযির হয়েছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো, তারা (কারুণের জাঁকজমক এবং শান-শওকত দেখে) বললো, "হায়! কারুণকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, যদি তা আমাদেরকেও দেয়া হতো। নিশ্চয় সে অত্যন্ত ভাগ্যবান"।

(৮০) আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বললো, "তোমরা নিপাত যাও, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের পুরস্কারই উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। আর যারা সবর অবলম্বনকারী, তারা ব্যতীত এ মর্যাদা আর কেউ পাবেনা"।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কারুণের সম্প্রদায় তাকে কয়েকটি উপদেশমূলক কথা বলেছেঃ

(এক) অর্থ সম্পদের কারণে তুমি দাম্ভিক হয়ে গেছ, খবরদার! দাম্ভিক হয়োনা, কেননা আল্লাহ্ পাক দাম্ভিক লোকদেরকে পছন্দ করেন না,

(দুই) তোমার যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা দ্বারা আখেরাতের সাফল্য কামনা কর,

(তিন) যেভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাকে অর্থ-সম্পদ দান করে তোমার প্রতি এহসান করেছেন, তুমিও আল্লাহর বন্দাদের প্রতি এহসান কর। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অর্থ-সম্পদ বিতরণ কর, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ কর,

(চার) পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

কারুণ এসব কথার জবাবে যা বলেছে, তাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ

(কারুণ বললো, আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা আমার বিশেষ জ্ঞানের কারণেই দেয়া হয়েছে।)

অর্থাৎ কারুণ বললো, আমার গুণে জ্ঞানে অর্জন করেছি সব কিছু, এখানে আল্লাহ পাকের দয়ার কথা যা তোমরা বলছো তা ঠিক নয় (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। আমার সম্পদ, সম্মান, নেতৃত্ব যা কিছু রয়েছে, সবই আমার যোগ্যতার ফলশ্রুতি, কোন দাতার দান নয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের علم শব্দটি দ্বারা মুদ্রা তৈরীর বিশেষ জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) এ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তিনি তার কিছু অংশ ইউশা এবনে নুনকে শিখিয়েছিলেন। আর এক তৃতীয়াংশ

শিখিয়েছিলেন কালেব বিন ইউকান্নাকে। আর এক তৃতীয়াংশ শিখিয়েছিলেন কারুণকে। কারুণ ইউশা এবং কালেবকে প্রতারণা করে তাদের নিকট রক্ষিত জ্ঞানও অর্জন করে, এভাবে সে সম্পদ বৃদ্ধির যাবতীয় পন্থার জ্ঞান আয়ত্ত করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের علم শব্দটি দ্বারা ব্যবসায়ের রহস্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে যে ব্যবসা লাভজনক হয় তার জ্ঞান আমার রয়েছে, আর এভাবে আমি এ অগাধ সম্পদ অর্জন করেছি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) কারুণের নিকট যাকাত আদায়ের জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কারুণ শুধু যে যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই নয়; বরং অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলে যে এত দিন অনেক কিছু সহ্য করেছি আর নয়, এখন দেখি মুসা আমাদের ধন-সম্পত্তিতেও অংশীদার হতে চায়। তোমরা কি তা মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছ? তখন কিছু লোক বললো, না। অন্যরা নীরব রইল। এভাবে কারুণ একদিকে দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, অন্যদিকে সে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অথচ কারুণ যে গুণ-জ্ঞানের কথা বলেছে, তা-ও আল্লাহ পাকেরই দান, আর যে অক্লান্ত সাধনা সে করেছে, তা-ও আল্লাহ পাকের তওফিকেই সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং কারুণের অস্তিত্ব বা তার জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব সবই তো এক আল্লাহ পাকের দান, অতএব যোগ্যতার বড়াই করার কোন যুক্তি তার আছে কি? যদি আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি না করতেন বা যে যোগ্যতার বড়াই সে করছে সে যোগ্যতা দান না করতেন, তবে কি সে এ সম্পদ এবং মর্যাদার অধিকারী হতো?

অতএব, তার এ দাবী যে 'অর্থ সম্পদ উপার্জনের নিগুঢ় তত্ত্বটি আমার জানা আছে' কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু সম্পদের অধিকারী হবার পর সে সব যুক্তির কথা ভুলে গেছে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক কারুণের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার প্রতি-উত্তরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ

"সে কি জানেনা যে আল্লাহ পাক তার পূর্বে এমন বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়ে অধিকতর সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিল"।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক অনেক অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতিকে ধ্বংস করেছেন, যারা ধনবলে বাহুবলে তার চেয়ে অনেক বেশী বলীয়ান ছিল, কিন্তু তাদের ধনবল বা বাহুবল আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

পূর্ববর্তী ধ্বংস-প্রাপ্ত জাতিগুলোর ঘটনা থেকে কারুণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। আল্লাহ পাকই আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন, সামুদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, শাদ্দাদ এবনে আদ অত্যন্ত বড় ক্ষমতাধর রাজা ছিল, তাকেও ধ্বংস করেছেন, তাদের অর্থ-সম্পদ অঢেল ছিল, কিন্তু তাদের জনবল এবং ধনবল তাদের কোন উপকার করতে পারেনি।

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

"যখন আল্লাহ্ পাকের আযাব আসবে তখন পাপীষ্ঠ লোকদেরকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা"।

কেননা আল্লাহ্ পাক তাদের পাপাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

অথবা এর অর্থ হলো, কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ পাপীষ্ঠদেরকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, কেননা তাদের চেহারার চিহ্ন দ্বারাই ফেরেশতাগণ বুঝে নেবেন যে তারাই অপরাধী।

অথবা এর অর্থ হলো, কেয়ামতের দিন এ ধরণের অপরাধীকে কোন প্রশ্ন করা হবেনা এবং কোন হিসাব-নিকাশ না নিয়ে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা তাদের অপরাধ এত বেশী হবে যে তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজনই হবে না।

অথবা এর অর্থ হলো, এমন অপরাধীদেরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়না।

অথবা এর অর্থ হলো, যখন সময় আসে তখন পাপীষ্ঠদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়না এবং তাদের কোন ওজর-আপত্তিও শ্রবণ করা হয়না।[১]

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো এমন জঘন্য অপরাধীদেরকে কোন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা না করে এবং কোন হিসাব-নিকাশ না নিয়েই দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরেশতারা এ অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না, বরং তাদের চেহারা দেখেই বুঝবেন যে তারা অপরাধী।

আর তফসীরকার হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, তাদেরকে তাদের অবস্থার খোঁজ নিতে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা তবে ধমক দেয়ার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।[২]

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, পাপীষ্ঠদেরকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই, কেননা জিজ্ঞাসাবাদ তাদেরকে করা হয় যাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে, আর পাপীষ্ঠদের বিবেক-বুদ্ধির কোন বালাই নেই। যদি বিবেক-বুদ্ধি থাকত, তবে এমন অন্যায় অপরাধ করতো না। তাই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৪১
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১২১
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৪৬

"এরপর সে তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে হাযির হয়েছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো, তারা (কারুণের জাঁকজমক এবং শান-শওকত দেখে) বললো, "হায়! কারুণকে যা কিছু দেয়া হয়েছে যদি তা আমাদেরকেও দেয়া হতো! নিশ্চয় সে অত্যন্ত ভাগ্যবান"।

কারুণকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যে উপদেশ দিয়েছিল, তা সে গ্রহণ করেনি, এমনকি পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসের যে বিবরণ তাকে জানানো হয়েছিল, তা থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এমনি অবস্থায় সে তার দলবল নিয়ে মূল্যবান পোশাক পরিধান করে জনসমক্ষে বের হয়।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, কারুণ সেদিন তার চাকর-বাকর এবং তার গোত্রীয় লোকদের নিয়ে লাল বর্ণের পোশাক পরে বের হয়।

এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেন, কারুণ ৭০ হাজার লোক নিয়ে বের হয়, তারা সকলেই জাফরানী বর্ণের পোশাকে সুসজ্জিত ছিল।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, কারুণ সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিল, খচ্চরের উপর সোনালী রংয়ের জ্বিন ছিল। চার হাজার লোক তার সঙ্গে তার শান-শওকত প্রকাশার্থে বের হয়েছিল। তাদের সঙ্গে তিনশত বাঁদী ছিল। যারা দুনিয়ার লোভ-লালসায় কাতর ছিল, কারুণের শান-শওকত দেখে তাদের মন আকৃষ্ট হয়েছিল, তারা আক্ষেপ করে বলেছিল, যদি কারুণের ন্যায় ধন-সম্পদ আমাদের হতো তবে আমরা কত ভাগ্যবান হতাম!

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ

"আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বললো, "তোমরা নিপাত যাও, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের পুরস্কারই উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। আর যারা সবর অবলম্বনকারী তারা ব্যতীত এ মর্যাদা আর কেউ পাবে না"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাদের বিচার-বুদ্ধি দিয়েছিলেন, যারা পরিণতির নিরিখে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করতো, যারা পরিণামদর্শীতার গুণে গুণান্বিত ছিল এবং যারা অন্তর-দৃষ্টির অধিকারী ছিল তারা বলে, কারুণের ধন সম্পদ যতই থাকুক না কেন দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েক দিনের ব্যাপারই তো, এর বেশি তো নয়? আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আদৌ এর কোন গুরুত্ব নেই। অথচ মোমেনগণের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে যে শুভ পরিণতি বা মহা মূল্যবান প্রতিদান রয়েছে, তার তুলনায় কারুণের ধন-সম্পদ কিছুই নয়। অবশ্য একথা সর্বজনস্বীকৃত যে আখেরাতের মহা প্রতিদান সকলের ভাগ্যে জুটবে না। যারা সবর অবলম্বনকারী, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া মোহে আত্মহারা না হয়ে আখেরাতের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায়, অবশেষে তারাই হয় ভাগ্যবান।

أُوتُوا الْعِلْمَ

অর্থাৎ সে সব লোক যাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আর প্রকৃত জ্ঞান হলো তা, যা দুনিয়া এবং আখেরাত সম্পর্কে আসমানী গ্রন্থ সমূহে এবং নবী রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক দান করেছেন। দুনিয়ার লোভ-লালসায় মত্ত না হয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে উপকারী আমলের যে সওয়াব আল্লাহ পাক রেখেছেন তার এলম যারা রাখে, আর সে এলমের উপর যাদের একীন থাকে এবং সে একীন মোতাবেক যারা আমল করে, এখলাস বা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে ঐ নেক আমল যাদের আমৃত্যু অব্যাহত থাকে, তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে صابر বা ধৈর্য ধারণকারী বা সবর অবলম্বনকারী বলা হয়েছে।

যারা এ গুণের অধিকারী হন, আলোচ্য আয়াতে তাদের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। তারাই বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং নেক আমলের তুলনায় কারুণের ধন-সম্পদ হীন, তুচ্ছ। আর তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের এই উপদেশ শুধু দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত সবর অবলম্বনকারীগণই লাভ করে। অথবা এর অর্থ হলো, ঈমান এবং নেক আমলের সম্পদ শুধু সবর অবলম্বনকারীগণ লাভ করে। অথবা এর অর্থ হলো, আখেরাতের অশেষ নেয়ামত শুধু তারাই লাভ করে যারা দুনিয়ার সৌন্দর্য ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করে। এজন্যে মরমী কবি বলেছেনঃ

اهل صبر از جمله عالم برترند+ صابران از اوج گردون بگزرند

(সবর অবলম্বনকারীগণ সমগ্র বিশ্বে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সবর অবলম্বনকারীগণ পরিভ্রমণকারী।)

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا ﴿٨١﴾
كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ
وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ
لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۭ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا
يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾
مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

তরজমা

(৮১) এরপর আমি তাকে তার প্রাসাদ সহ ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম, তখন তার পক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে তাকে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় কারো সাহায্য লাভ করতে পারেনি।

(৮২) গতকাল বিকেলে যারা তার ন্যায় সম্পদ লাভের আকাংক্ষা করেছিল, তারা আজ ভোর বেলায় বলতে লাগল, মনে হয় আল্লাহ্ পাক তার বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক হ্রাস করে দেন। যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত না হতো, তবে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে কাফেররা সফলকাম হয়না।

(৮৩) এটি আখেরাতের সেই আবাস-স্থল যা আমি তাদেরকে দান করবো যারা পৃথিবীতে বড়াই করেনা এবং ফেতনা-ফ্যাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করেনা, আর শুভ পরিণতি শুধু পরহেযগারদের জন্যে।

(৮৪) যে সৎ কাজ করে আসবে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে সে তার কর্ম অনুপাতেই শাস্তি পাবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কারুণের ষড়যন্ত্র

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কারুণ জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে জনগণের সামনে তার দলবল সহ উপস্থিত হয়। কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-কে অত্যধিক হিংসা করতো, এজন্যে সে তাঁকে জনসাধারণের সম্মুখে অপমানিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, সে একজন স্ত্রীলোককে বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে এজন্যে তৈরী করে যে সে যেন মজলিসের মধ্যে দাঁড়িয়ে হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়। কয়েকদিন পরই হযরত মুসা (আঃ) জনসাধারণের উদ্দেশে যখন আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলেন, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্ পাকের হুকুম হলো কোন বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। ঠিক ঐ মুহূর্তে কারুণের নিয়োজিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, যদি তুমি এ অন্যায় কর তবু কি এ শাস্তি হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। এরপর কারুণের লোকেরা সেই ভাড়া করা স্ত্রীলোকটিকে মজলিসে হাযির করলো এবং উপস্থিত জনতার সম্মুখে স্ত্রীলোকটি হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়। ঐ স্ত্রীলোকটি বলে, মুসা স্বয়ং আমার সঙ্গে ব্যাভিচার করেছে (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক), তখন হযরত মুসা (আঃ) তাকে মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আল্লাহ্ পাকের নামের শপথ দিয়ে বলেন, তুমি সত্য কথা বল। ঐ সময় স্ত্রীলোকটির অন্তরে অত্যন্ত ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়, সে বলে হে মুসা! যখন আপনি আমাকে আল্লাহ্ পাকের নামের শপথ দিয়েছেন, তখন আমি সত্য কথা বলবো। এরপর সে বলে, কারুণ আমাকে অনেক অর্থ-সম্পদ দিয়েছে

এবং বলেছে, আমি যেন আপনার বিরুদ্ধে এ অপবাদ দেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি পবিত্র, আর একথারও সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ পাকের রসূল। এভাবে কারুণের ষড়যন্ত্রের রহস্য সর্বসমক্ষে ফাঁস হয়ে যায়।

কারুণের ভয়াবহ পরিণতি

স্ত্রীলোকটির সত্য কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হন এবং ক্রন্দণরত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সত্য নবী হই, তবে কারুণের উপর তোমার গজব নাজিল কর। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হলো, হে মুসা! আমি জমীনকে হুকুম দিয়েছি, তুমি কারুণের ব্যাপারে তাকে যে আদেশই দেবে সে যেন তা পালন করে। এরপর হযরত মুসা (আঃ) জমীনকে আদেশ দিলেন-

يا ارض خذيه

হে জমীন! তাকে ধর, জমীন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলল এবং সে ভূগর্ভের দিকে ধ্বসে যেতে লাগল, শুধু কারুণই নয়; তার প্রাসাদ এবং ধন-সম্পদ সহ সে ধ্বসে গেল।[১]

হাদীস শরীফে কারুণ সম্পর্কে একথার উল্লেখ রয়েছে যে কেয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে জমীন তার দেহকে হজম করবে না; বরং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে কারুণ ভূগর্ভে ধ্বসে যেতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কারুণ প্রত্যহ এতখানি নিচের দিকে ধ্বসে যাবে যতখানি তার দেহের দৈর্ঘ রয়েছে, আর যেদিন কেয়ামতের জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন সে জমীনের গভীর তলদেশে পৌছে যাবে।[২]

বস্তুতঃ ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা ছিল, ঠিক তেমনি কারুণের ভূগর্ভে ধ্বসে যাওয়াও হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা ছিল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কারুণ একদিকে হযরত মুসা (আঃ)-এর আত্মীয় ছিল, তৌরাতের এলম সে অর্জন করেছিল এবং অতি মধুর কণ্ঠে সে তৌরাত তেলাওয়াত করতো, পাশাপাশি সে অগাধ বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ছিল, কিন্তু সে ছিল অহংকারী, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ পাকের বিধানের ব্যাপারে সে সীমা-লংঘন করতো, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তার ঔদ্ধত্য, হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১২২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ২৪৫
২। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৩১৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ২৪৫

যে তোমার জাতিকে বল তাদের চাদরের চার কোণে একটি নীল আকাশী বর্ণের সুতা ব্যবহার করতে, যাতে করে ঐ সুতাটি দেখে তারা আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তারা যেন এ সত্য উপলব্ধি করে যে আল্লাহ্ পাক এ কালাম আসমান থেকে নাজিল করেছেন। হযরত মুসা (আঃ) এ আদেশ পেয়ে আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার এ আদেশ এভাবে পালিত হতে পারে না যে প্রত্যেকে তার চাদর আকাশী বর্ণের কাপড় দ্বারা তৈরী করবে? কেননা বণী ইসরাঈল নীল আকাশী বর্ণের এ সুতোকে অপছন্দ করবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমার আদেশ ছোট হলেও ছোট নয়, যদি বণী ইসরাঈল আমার ছোট আদেশ না মানে, তবে বড় আদেশ কি করে মানবে?

যাহোক, হযরত মুসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে একত্রিত করে আল্লাহ্ পাকের আদেশ জানিয়ে দিলেন, বণী ইসরাঈলী সকলে এ আদেশ মেনে নিল, শুধু কারুণ এ আদেশ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, সে বললো, এ কাজ তো গোলামরা করে যাতে করে মুনীব তার গোলামদেরকে চিনতে পারে। কারুণের নাফরমানীর এটি ছিল সূচনা। এরপর হযরত মুসা (আঃ) যখন বণী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র তীরে গমন করেন, তখন বণী ইসরাঈলের পক্ষে সকল কোরবাণীর দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত হারুন (আঃ)-এর উপর। বণী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের স্ব-স্ব কোরবাণীর জন্তু হযরত হারুন (আঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। তিনি ঐ জন্তুগুলো কোরবাণীর জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেন, এরপর আসমান থেকে একটি অগ্নি এসে তা খেয়ে ফেলত। এসব কিছুর তত্ত্বাবধান করতেন হযরত হারুন (আঃ)। কিন্তু কারুণ হযরত হারুন (আঃ)-এর এ নেতৃত্ব দানকেও পছন্দ করতোনা। তাই সে হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললো, মুসা তোমার জন্যে তো রেসালতের ব্যবস্থা হয়েছে, হারুন কোরবাণীর ব্যাপারে নেতৃত্ব পেয়েছে, আমি তো তৌরাতের সর্বোত্তম পাঠক, অথচ আমি কিছুই পেলাম না, আমি এ অবস্থার উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আমি নিজে হারুনকে এ দায়িত্ব দেইনি; বরং আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ পদ দান করেছেন।

কারুণ বললো, আমি তোমার একথা সে পর্যন্ত মেনে নেব না যে পর্যন্ত আমার নিকট এর প্রমাণ উপস্থিত না কর। হযরত মুসা (আঃ) তখন বণী ইসরাঈলকে আদেশ দিলেন, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ লাঠি বৃক্ষের ন্যায় এ তাঁবুর ভেতরে স্থাপন কর। নির্দেশ মোতাবেক সকলেই নিজ নিজ লাঠি এনে দাঁড় করিয়ে দিল। রাত এভাবেই অতিবাহিত হলো। সকালে লোকেরা দেখল, হযরত হারুন (আঃ)-এর লাঠিটি একটি বৃক্ষের ন্যায় সবুজ পাতায় পল্লবিত হয়েছে, কারুণ বললো, হে মুসা! তুমি যেসব যাদু ইতিপুর্বে প্রদর্শন করেছ, এ যাদুটি তার চেয়ে বেশী বিস্ময়কর নয়। এরপর কারুণ হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট থেকে সরে গেল। হযরত মুসা (আঃ) আত্মীয়তার কারণে তার সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু সে সর্বদা হযরত মুসা (আঃ)-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তৎপর থাকত। সে এরপর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো যার দরজা তৈরী করলো স্বর্ণ দ্বারা এবং তার দেয়ালগুলোতে স্বর্ণের পাত বসিয়ে দিল। বণী ইসরাঈলের বড় বড় লোকেরা সকাল-সন্ধ্যা

তার নিকট আসত, হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হতো, কারুণের সঙ্গে তারা কথা বলতো, কারুণ তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতো। এভাবে আনন্দ-উল্লাসের আসর বসত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-কে যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানুষের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের আদেশ দেয়া হলো, তখন হযরত মুসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। সকলে এ আদেশ মেনে নিল, কিন্তু কারুণ অমান্য করলো। এরপর হযরত মুসা (আঃ) তার সাথে প্রতি হাজারে এক দিনার এবং প্রতি হাজারে একটি বকরী প্রদানে একটি মীমাংসায় উপনীত হলেন, কারুণ যখন বাড়ী ফিরে এ সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করে দেখল যে এক বিরাট অংকের অর্থ চলে যায়, তখন সে যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানালো। বণী ইসরাঈলকে ডাক দিয়ে সে বললো, এ পর্যন্ত মুসা (আঃ) যে আদেশই দিয়েছে, আমরা মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন তো সে আমাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে, বণী ইসরাঈলের লোকেরা বললো, আপনি আমাদের অভিভাবক, আপনি যা ইচ্ছা আদেশ দেবেন আমরা তা পালন করবো। তখন কারুণ বললো, আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি অমুক ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে আস, আমি তাকে বিনিময় দিয়ে এমন ব্যবস্থা করবো যাতে করে সে মুসার উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়। যদি সে তা করে তবে বণী ইসরাঈল মুসা (আঃ)-কে ছেড়ে দেবে, তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যাবে, তাই লোকেরা ঐ স্ত্রীলোকটিকে হাযির করলো, কারুণ তাকে এক হাজার দেরহাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। আর কোন কোন বর্ণনায় তাকে স্বর্ণের একটি পাত দানের কথা বলা হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আমি তোমাকে সম্পদশালী করে দেব, যদি তুমি মুসা (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিতে পার।

দ্বিতীয় দিন কারুণ বণী ইসরাঈলের লোকদেরকে একত্রিত করে মুসা (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো এবং তাঁকে বললো, বণী ইসরাঈল আপনার অপেক্ষায় আছে, আপনি তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করুন। হযরত মুসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বললেন, হে বণী ইসরাঈল! শোন, যে চুরি করবে আমরা তার হাত কেটে দেব, আর যে কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেবে তাকে আমরা বেত্রাঘাত করবো আর যে ব্যাভিচার লিপ্ত হবে তাকেও আমরা বেত্রাঘাত করবো যদি সে অবিবাহিত হয়, আর যদি বিবাহিত অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করবো। কারুণ বললো, যদি এই অপরাধ তুমি নিজে কর তবে এ শাস্তি কি তুমি ভোগ করবে? হযরত মুসা (আঃ) বললেন, যদি আমি অপরাধ করি তবুও। কারুণ বললো, বণী ইসরাঈলের ধারণা তুমি নিজে অমুক স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যাভিচার করেছ। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, তাকে ডাক, যদি সে একথা বলতে পারে তবে তাই হবে। হযরত মুসা (আঃ) ঐ স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছি যা এই লোকেরা বলছে? হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আমি সেই আল্লাহ পাকের শপথ দিয়ে বলছি, যিনি এই বণী ইসরাঈলের জন্যে লোহিত সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছেন এবং তৌরাত নাজিল করেছেন। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি সত্য কথা বলবে না? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক ঐ

স্ত্রীলোকটির মনের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন এবং সে চিন্তা করলো, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে আজ তওবা করে নেয়া আমার জন্যে উত্তম। তাই সে বললো, লোকেরা আপনার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে, কারুণ আমাকে অর্থ-সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যেন আমি আপনার প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেই। হযরত মুসা (আঃ) একথা শ্রবণ মাত্রই সেজদায় রত হলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সত্য নবী হই, তবে আমার কারণে তার উপর গজব নাজিল কর। আল্লাহ পাক তখন ওহী প্রেরণ করলেন এবং বললেন, হে মুসা! আমি জমিনকে তোমার কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছি, তুমি যে আদেশই দেবে সে তা পালন করবে। এরপর হযরত মুসা (আঃ) বললেন, হে বণী ইসরাঈল! আল্লাহ পাক যেভাবে আমাকে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছেন, সেভাবে আমাকে কারুণের নিকটও প্রেরণ করেছেন। এখন যে তার নিকট থাকতে চায় থাকুক, আর যে আমার নিকট আসতে চায় আসুক এবং তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। একথা শ্রবণ করে সমস্ত লোক কারুণকে ছেড়ে দিয়ে মুসা (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। শুধু দুটি লোক কারুণের সাথে রয়ে গেল। হযরত মুসা (আঃ) জমিনকে আদেশ দিলেন, হে জমিন! তাকে ধর। জমিনে তার পা ধ্বসে গেল। তিনি পুনরায় আদেশ দিলেন। তখন হাটু পর্যন্ত তাকে জমিন গিলে ফেললো। এরপর তিনি পুনরায় জমিনকে আদেশ দিলেন। তখন তার কোমর পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে গেল। এরপর হযরত মুসা (আঃ) জমিনকে আবার আদেশ দিলেন তখন তার গলা পর্যন্ত মাটির নীচে চলে গেল। কারুণ এবং তার সাথীরা তখন মুসা (আঃ)-এর নিকট ক্রন্দণ করতে লাগলো এবং তাকে রক্ষা করার জন্যে এমনকি, সে ৭০ বার পর্যন্ত তাঁর নিকট আরজী করলো। কিন্তু ক্রোধের কারণে তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। এমনিভাবে কারুণ ও তার দু' সাথীকে জমিন গিলে ফেললো।

আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করে এরশাদ করলেন, হে মুসা! কারুণ তোমার নিকট ৭০ বার ফরিয়াদ করলো, কিন্তু তুমি একবারও তা গ্রহণ করলে না, শপথ আমার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের, যদি সে একবারও আমার নিকট ফরিয়াদ করতো তবে আমি তার ফরিয়াদ গ্রহণ করতাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, জমীনকে আর কখনও কারো অনুগত হওয়ার আদেশ দেব না।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কারুণকে জমিনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। আর সে একজন মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রত্যহ নীচের দিকে যেতে থাকবে, কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত জমীনের গভীরের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। যখন কারুণকে জমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো, তখন বণী ইসরাঈলীরা পরস্পর বলতে লাগলো, হযরত মুসা (আঃ) যে কারুণের ব্যাপারে বদ দোয়া করেছেন, তার কারণ হলো, তিনি কারুণের অগাধ সম্পদের মালিক হতে চেয়েছেন, তখন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, ফলে আল্লাহ্ পাক কারুণের বাড়ী-ঘর, ধন-ভান্ডার সহ সব কিছু মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন। আলোচ্য আয়াতে-

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ

একথাই এরশাদ হয়েছে।[১]

নবী (আঃ)-এর শানে বেআদবীর পরিণতি

আল্লাহ পাকের নবীর শানে বেআদবী এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পরিণতি এভাবেই হয়, কারুণের জীবন্ত সমাধি ঘটে। এতে একথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাক যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, আর তিনি তাদের শাস্তি বিধানের ইচ্ছা করেন, তখন ঐ সংকটময় মুহূর্তে মানুষের ধনবল, বাহুবল, জনবল কোন কিছুই তার জন্যে উপকারী হয়না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"তখন তার পক্ষে এমন কোন দল ছিলনা যে তাকে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় কারো সাহায্য লাভ করতে পারেনি"।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ

"গতকাল বিকেলে যারা তার ন্যায় সম্পদ লাভের আকাংক্ষা করেছিল তারা আজ ভোর বেলায় বলতে লাগলো, মনে হয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্য যাকে ইচ্ছা তাকে রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক হ্রাস করে দেন"।

অর্থাৎ যখন সকাল হলো, গাফলতের নিদ্রা ভাঙ্গলো তখন গতকাল পর্যন্ত যারা কারুণের শান-শওকত দেখে তার মত ধনী হওয়ার আকাংক্ষা করেছিল এবং কারুনের ন্যায় ভাগ্যবান না হওয়ার কারণে আক্ষেপ করেছিল, আজ তাদের চেতনা ফিরে এসেছে, তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অবগত হয়েছে তারা বলেছে,

يَقُوْلُوْنَ

"আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়াতেই রক্ষা পেলাম, যদি তা না হতো তবে কারুণের ন্যায় আমাদেরও ধ্বংস অনিবার্য ছিল"।

মূলতঃ দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন, এটি তাঁর মর্জির ব্যাপার এবং আল্লাহ পাক যা দান করেন, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই বন্দার কাজ, আর যা পাওয়া যায়নি তা নিয়ে আক্ষেপ না করা মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য অর্থ সম্পদ হলো অতি সুন্দর একটি বিষধরের ন্যায়, বাইরের রূপ তার সুন্দর, কিন্তু ভেতরে রয়েছে বিষ, আল্লাহ পাক যাকে যেমন বিবেচনা করেন তেমনি তাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। এটি শুধু তাঁর দানই। আর যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সংকীর্ণ করেন এবং তাকে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত করেন, এটি তাঁর ইচ্ছা। বন্দার কাজ হলো সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৪৮-৫১

পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

"যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত না হতো তবে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন, এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে কাফেররা সফলকাম হয়না"।

সাফল্য শুধু নেককার মোমেনদের জন্যে। যারা আল্লাহর অবাধ্য, নাফরমান এবং অকৃতজ্ঞ হয়, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের ব্যর্থতা এবং বিপদ অবধারিত। মানুষ তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সর্বদা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা, তাই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অবস্থায় অধৈর্য হয়ে পড়ে। আর যখন তাকে ধন-সম্পদ দেয়া হয় তখন সে ধরাকে সরা মনে করে এবং আত্মহারা হয়ে পড়ে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অর্থ-সম্পদ লাভ হলে বন্দার কাজ হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে যদি অর্থ-সম্পদ যে পরিমাণ কাম্য তা না পাওয়া যায় তবে সবর অবলম্বন করা।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

"এটি আখেরাতের সেই আবাস-স্থল যা আমি তাদেরকে দান করবো, যারা পৃথিবীতে বড়াই করেনা এবং ফেতনা-ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করেনা"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কারুণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এরপর তত্ত্বজ্ঞানী লোকদের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে যে দুনিয়ার নেয়ামত থেকে আখেরাতের নেয়ামত উৎকৃষ্ট। আর এ আয়াত থেকে এরশাদ হয়েছে, আখেরাতের নেয়ামত কারা লাভ করবে?

যাঁদের জন্যে জান্নাত

لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত শুধু তাদের জন্যে যারা দুনিয়াতে অহংকারী হয়না, বড়াই করেনা। কারুণ ও ফেরাউনের ন্যায় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেনা; বরং যারা ঈমানদার হয়, শোকর গুজার হয়, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের পাশাপাশি তারা আনুগত্যও প্রকাশ করে এবং তাঁর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করে। এর জন্যে পূর্বশর্ত হলো, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। যারা এ শর্ত পালন করে তারাই মোত্তাকী, পরহেযগার, তাদের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

এজন্যে কথায় বলে শেষ ভাল যার সব ভাল তার। আর যে মোত্তাকী পরহেযগার তারই শেষ ভাল হয়।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

অর্থাৎ আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী যার খবর তোমরা পেয়েছ এবং যে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবগত করানো হয়েছে।

عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ

এর ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, অর্থাৎ সে সব লোক যারা অহংকারের কারণে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নে বিরত থাকেনা। আতা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো যারা মানুষের প্রতি জুলুম করেনা, মানুষকে ক্ষুদ্র বা হেয় মনে করেনা। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো যারা শাসনকর্তাদের নিকট সম্মান এবং পদ মর্যাদার প্রার্থী হয় না। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে সব শাসনকর্তাদের সম্পর্কে যারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বিনয়ী হয়। তারা অহংকারী হয়না, নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয় না। কালবী (রঃ) বলেছেনঃ 'ফাসাদ' শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এবাদতের প্রতি আহবান করা। একরামা (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা। এবনে জোরায়েজ এবং মোকাতেল (রঃ) 'ফাসাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়া।

শুভ পরিণতি পরহেযগারদের জন্যে

العاقبة শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এটি হলো জান্নাত। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো নেক আমলের শুভ পরিণতি বা সওয়াব। আর মন্দ কাজ তথা পাপাচারের শোচনীয় পরিণতিকে 'একাব' বলা হয়।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা। নেক আমল করা। আর তাকওয়ার গুণ অর্জনের জন্যে অহংকার পরিহার করা একান্ত জরুরী।

আর এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাষার ঘোষণা করা হয়েছে, সকল অশান্তির মূল ভিত্তি হলো অহংকার এবং আখেরাতের ব্যাপারে গাফলত।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে, অহংকার করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে, যেমন ফেরাউন কারুণরা করেছিল তাদের পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ।

পক্ষান্তরে, যারা বিনম্র ও বিনয়ী হয়, যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে তারাই আখেরাতের চির শান্তি লাভ করে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১২৫-২৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৫২

বর্ণিত আছে যে আদী এবনে হাতেম যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হন, তখন তিনি তাঁর জন্যে একটি কুষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু আদী (আদব রক্ষার্থে) মেঝেতে বসেছিলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে তুমি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী হবেনা এবং অহংকার করবেনা। এরপর আদী ইসলাম গ্রহণ করেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) আলোচ্য আয়াতখানি সর্বদা পাঠ করতেন।১

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ
قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

তরজমা

(৮৫) (হে রসূল!) যিনি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআনের হুকুম প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় তিনি আপনাকে প্রত্যাবর্তন-স্থলে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন। (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(৮৬) (হে রসূল!) আপনি কখনও আশা করেননি যে আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করা হবে, এটি আপনার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, অতএব (হে রসূল!) কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না।

(৮৭) (হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের বিধান নাজিল হওয়ার পর তারা যেন

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১২৫-২৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৪৬

আল্লাহর হুকুম থেকে আপনাকে নিবৃত্ত রাখতে না পারে। আর আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকুন, আর কিছুতেই শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(৮৮) আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদকে ডাকবেন না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই, আর তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আখেরাত সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে যারা মোত্তাকী পরহেযগার, যারা অহংকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী নয়, তাদের জন্যেই রয়েছে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর শান্তি এবং সাফল্য।

আর আলোচ্য আয়াত সমূহের মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এতে রয়েছে একটি বিরাট সুসংবাদ এবং কয়েকটি উপদেশ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করছিলেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত চিন্তিত। তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সুসংবাদ দান করেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ফিরিয়ে আনবেন, আর আপনার এ প্রত্যাবর্তন হবে বিজয়ীর বেশে।

অথবা কথাটি এভাবে বলা যায় যে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে যে মোত্তাকী পরহেযগারগণই শেষ বিজয় লাভ করবে অর্থাৎ আখেরাতের চির শান্তি মোত্তাকী পরহেযগারগণই লাভ করবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে পরহেযগারদের সাফল্য শুধু যে আখেরাতেই হবে তা নয়; বরং দুনিয়ার এ জীবনেও তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। যদিও (হে রসূল!) আপনাকে সাময়িক ভাবে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করতে হয়েছে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে বিজয়ীর বেশে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রত্যাবর্তন করাবো। সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে আপনাকে প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়; বরং আপনাকে পুনরায় মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রত্যাবর্তনের তওফিক দেয়া হবে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ..

যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক আপনাকে পবিত্র কোরআন দান করেছেন তিনিই আবার আপনাকে আপনার মাতৃভূমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আল্লামা বগভীও (রঃ) একথা লিখেছেন। তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যিনি আপনার প্রতি কোরআন নাজিল করেছেন, তার তেলাওয়াত এবং তবলীগকে অবশ্য কর্তব্য

করেছেন, তিনিই কোরআনের মহান শিক্ষা মোতাবেক আমল করা ফরজ করেছেন।

لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের স্থান। এর দ্বারা মক্কা শহরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পরবর্তী কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনেই আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। উফি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তিনিও আলোচ্য শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তফসীরকার মুজাহেদও (রঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

কোতায়বী (রঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির معاد সে শহরই হয় যেখানে সে প্রত্যাবর্তন করে। معاد শব্দটির মধ্যে যে তানবীন (বা দুই যের) রয়েছে তা মক্কায়ে মোয়াজ্জমার উচ্চ মরতবা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত বহন করে। কেননা এটিই সেই পবিত্র স্থান যেখানে আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের পরই সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করছিলেন তখন গারে ছওরের দিক থেকে বের হন এবং সাধারণ পথ ছেড়ে অচেনা পথে চলতে থাকেন। যখন কাফেরদের তরফ থেকে হামলার আশংকা দূরীভূত হয় তখন তিনি পরিচিত পথে চলে আসেন। এরপর তিনি "জোহফা" নামক স্থানে আগমন করেন যা মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মাঝখানে অবস্থিত, সেখান থেকে মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফ উভয় দিকের পথ পাওয়া যায়। মক্কা শরীফের পথ দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে মক্কার কথা মনে হয়। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, আপনার অন্তরে কি মক্কার কথা মনে হয়েছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। জিব্রাঈল (আঃ) তখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। معاد অর্থ মৃত্যু। কেননা মৃত্যু হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার নাম। এজন্যেই মৃত্যুই হলো معاد যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

অর্থাৎ কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করেছেন, এরপর তিনি পুনরায় তোমাদেরকে প্রাণহীন করবেন।

জুহরী এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, معاد অর্থ হলো কেয়ামত। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো জান্নাত। কেননা নেককারদের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। তাই এ আয়াতে নেককার মুসলমানদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া

হয়েছে।[১]

قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে"।

শানে নজুল

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন, তখন কতিপয় কাফের তাঁকে বললো, আপনি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। কাফেরদের এ অন্যায় উক্তির জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি সকলকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, আমার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক খুব ভালভাবে তাকে জানেন যে আমাকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, আর কে আমার নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে। তিনি ভাল করেই জানেন, কে হেদায়েত প্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট, তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে তার যথাযোগ্য ব্যবহার করবেন, যে হেদায়েত প্রাপ্ত, তার জন্যে রয়েছে শান্তির কেন্দ্র জান্নাত, পক্ষান্তরে যে পথভ্রষ্ট তার জন্যে রয়েছে শাস্তির কেন্দ্র দোযখ।

আলোচ্য আয়াতে معاد শব্দটি দ্বারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে সূরার শুরু এবং শেষ আয়াত সমূহের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান হয়। এ সূরার প্রারম্ভে রয়েছে যে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতাকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমার এ শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। এরপর এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে-

اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ 'এই শিশুটিকে আমি তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব'। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যেভাবে সূরার শুরুতে হযরত মুসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কৃত প্রতিশ্রুতির যে বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং তা যথাসময়ে পূর্ণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি সূরার শেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রত্যাবির্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর তা-ও যথা সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। অষ্টম হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৫৩

দ্বিতীয়তঃ হযরত মুসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট গমন করলেন এবং তাঁকে প্রদত্ত মোজেযা প্রদর্শন করলেন তখন ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযাকে যাদু মনে করলো এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন হযরত মুসা (আঃ) বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَقَالَ مُوسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى ..... اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"আর মূসা বললো, আমার প্রতিপালক খুব ভাল ভাবেই জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কার হবে শুভ পরিণতি, নিশ্চয় জালেমরা কখনও সফলকাম হয় না"।

এ সূরারই শেষ পর্যায়ে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"(হে রসূল! আপনি) বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল ভাবেই জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে"।

'কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে'-একথা দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে'- একথা দ্বারা কাফের মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

"আর (হে রসূল!) আপনি কখনও আশা করেননি যে আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করা হবে, এটি আপনার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে (হে রসূল!) আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল হবে এ বিষয়ে কখনও আপনি কল্পনাও করেননি, অথচ এটি আপনার প্রতিপালকের দয়া এবং রহমত যে তিনি আপনাকে এত বড় নেয়ামত দান করেছেন। অতএব একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন যে আপনার প্রতিপালক আপনাকে কখনও ব্যর্থ মনোরথ করবেন না, আপনি এক আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখুন, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।

فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ

"অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদের জন্যে সাহায্যকারী হবেন না"।

আপনি তাদের সাথে বিনম্র ভাবে কথা বলুন, তাদের অন্যায় আচরণ সহ্য করুন, কিন্তু তাদের সাহায্যকারী হবেন না।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মূলতঃ কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম গ্রহণের আহবান জানায়। তারই জবাবে

আল্লাহ পাক তাঁকে স্বীয় নেয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেন এবং কাফেরদের কোন প্রকার সাহায্য করতে নিষেধ করেন, শুধু তাই নয়, কাফেরদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ

"আর (হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের বিধান নাজিল হওয়ার পর তারা যেন আল্লাহর হুকুম থেকে আপনাকে নিবৃত্ত রাখতে না পারে। আর আপনার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকুন, আর কিছুতেই মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী, সমগ্র বিশ্বের জন্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তাই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তারাই তাঁর আপন-জন। তাই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ কাফেরদেরকে আপন-জন মনে করবেন না, তারা আপনার স্বজাতি বলেই আপনার সাথে সহযোগিতা করবে একথা কখনও ভাববেন না। তাই আপনার প্রতি যখন আল্লাহর কালাম কোরআনে করীম নাজিল হয়েছে তখন তারা যেন এর প্রচার-প্রসারে আপনাকে বিরত রাখতে না পারে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ

"আর (হে রসূল!) আপনি আপনার প্রতিপালকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে, তাঁর মারেফত হাসিলের জন্যে এবং তাঁর এবাদত বন্দেগী করার জন্যে মানুষকে আহবান জানান"।

এটিই মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ। আর এ পথ প্রদর্শন করাই আপনার কর্তব্য। অতএব, আপনি এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে থাকুন। কারো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে অবিচলিত থাকুন।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আর কাফের মুশরেকদের (সাহায্যকারী হয়ে তাদের) অন্তর্ভুক্ত হবেন না"।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

"আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকবেন না"।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

"তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই"।

প্রত্যেক পদক্ষেপে তওহীদ এবং এখলাসের মহান শিক্ষাকে সমুন্নত রাখুন। যদিও এ আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু

উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়া।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে, শুধু আল্লাহ পাকই চিরন্তন। তিনি চির বর্তমান, তাঁর কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই। আর এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"বিশ্ব ব্রম্মান্ডে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল, চির বিদ্যমান শুধু আপনার প্রতিপালকের পবিত্র সত্ত্বা যিনি মহিমময় মহানুভব"।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হতে পারে তা হলো প্রত্যেক কাজই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হবে তা অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে।

لَهُ الْحُكْمُ

(আদেশ প্রদানের অধিকার একমাত্র তাঁরই, আর তাঁর আদেশই সর্বত্র কার্যকর হচ্ছে)।

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আর তোমরা সকলে তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। প্রত্যেককে এক আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, প্রত্যেককে তাঁর মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েযের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ আয়াতখানি নাজিল হলো তখন ফেরেশতাগণ বললেন 'বিশ্ববাসী ধ্বংস হয়ে গেল'।

আর যখন كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ নাজিল হলো তখন ফেরেশতাগণ বললেন, 'প্রাণী মাত্রেরই ধ্বংস অনিবার্য'।

যখন আলোচ্য আয়াত كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ নাজিল হলো তখন ফেরেশতাগণ বললেন, 'আসমানবাসী জমীনবাসী সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল'।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৫২

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা আন্‌কাবুত

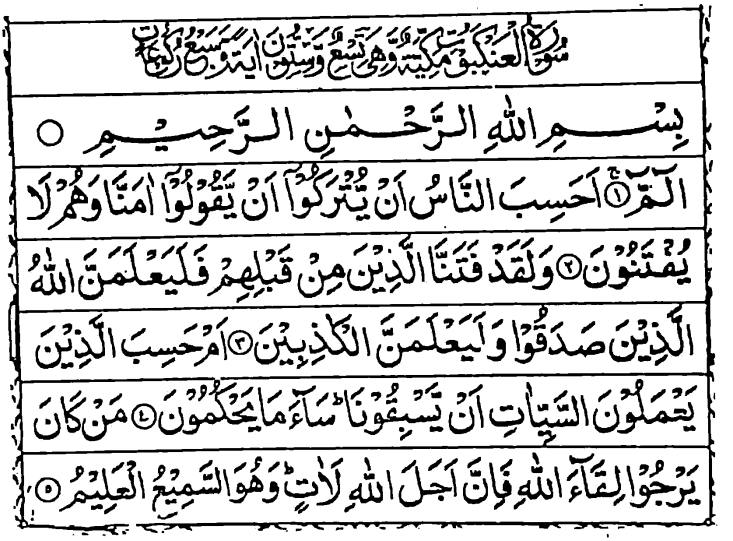
سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ① اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا

يُفْتَنُوْنَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ③ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ

يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ④ مَنْ كَانَ

يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে (শুরু করছি)।

তরজমা

(১) আলীফ লাম মীম।

(২) মানুষ কি মনে করে যে শুধু মাত্র "ঈমান এনেছি" বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?

(৩) আর নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ পাক অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী।

(৪) যারা পাপ কাজ করছে, তারা কি মনে করে যে আমার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত অতীব জঘন্য।(৫) যে কেউ আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষা রাখে তার জেনে রাখা উচিত যে নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে, তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন।

সূরা আনকাবুত প্রসঙ্গে

সূরা আনকাবুত হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় ৬৯ আয়াত এবং ৭টি রুকু রয়েছে।

নামকরণ

এ সূরায় শেরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ্ পাক আনকাবুত তথা মাকড়শার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই এ নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববতী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ) মক্কা বিজয়ের তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, সাফল্য সহজলভ্য বস্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা, যা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃঢ় হয়, শুধু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবীদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবীর সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত-উৎপীড়িত হন, এসব কিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত, এ সূরায় মোমেনদের জন্যে রয়েছে সান্ত্বনা, এ মর্মে যে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে যেন মোমেনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বণী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে তা ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু অবশেষে সে জুলুমের অবসান হয়েছে, মজলুম বণী ইসরাঈল জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করেছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা-ফাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় মক্কার কাফেরদের ফেতনা-ফাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মোমনেদেরকে সান্ত্বনা দেয়াই উদ্দেশ্য যে এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়।

যাহোক, এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হনেব, যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারশ্য এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমরা লাভ করবে, সে সময় দূরে নয়, যখন পারশ্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

অতএব, কখনও দুনিয়ার নেয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবেনা, অহংকার করোনা; বরং প্রাপ্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় কর, আর

একথা মনে রাখবে যে দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের তুলনায় মাকড়শার জালের চেয়ে বেশী কিছু নয়।[১]

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মোনাওয়্যারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবেনা। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

"মানুষ কি মনে করে যে শুধু মাত্র "ঈমান এনেছি" বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা"?

মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশে বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا

এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত কিছু মক্কাবাসী মুসলমানের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হওয়ার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন, কিন্তু মুশরেকরা তাদেরকে বাধা দিলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন, তখন তারা মক্কা শরীফ থেকে পুনরায় বের হন। কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ফলে কিছু লোক শহীদ হন। আর কিছু লোক জীবিত থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আর যারা আমার পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৫০

করি"।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রের উল্লেখ করে লিখেছেন, সূরায়ে আনকাবুতের প্রথম আয়াতের الناس শব্দটি দ্বারা মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা হলেন সালমা এবনে হেশাম, ইয়াশ এবনে রবীয়া, ওলীদ এবনে ওলীদ, আম্মার এবন ইয়াসের প্রমুখ।

এবনে সায়ীদ, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম হযরত ওবায়দুল্লাহ এবনে উমায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর রাহে তাঁকে চরম কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এবনে জোরায়েয (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম হযরত মাহজা এবনে আবদুল্লাহর সম্পর্কে। এ উম্মতের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে জান্নাতের দ্বারের দিকে আহবান করা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম তিনিই মুসলমানদের তরফ থেকে কাফেরদের মোকাবেলার জন্যে বের হয়ে এসেছিলেন। আমের এবনে হাজরামী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এদিক থেকে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ। যখন তাঁর পিতা মাতা এবং স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন নাজিল হয়, তখন প্রথম দিকে আল্লাহ পাক শুধু ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এরপর ধীরে ধীরে নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্ব এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ জারী হয়, কোন কোন লোকের জন্যে এসব বিধি-নিষেধের উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। শানে নজুল সম্পর্কীয় এ বিবরণ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এরূপঃ "মানুষ কি এ ধারণা করেছে যে শুধু ঈমান আনয়নের পরই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অন্যান্য বিধি-নিষেধ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা"?

এখানে উল্লেখ্য, শুধু ঈমান দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে নাজাতের কারণ হয়। আর কখনো না কখনো জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমলের অভাবে তথা ফরজ ওয়াজিব আদায় না করার কারণে সাময়িকভাবে শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাই আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা পেতে হলে দুটি বিষয় একান্ত জরুরী, (এক) আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, (দুই) মন যা চায় তা না করা; বরং মনের চাওয়াকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৫৫-৫৬

এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরও বিবরণ দিয়েছেন। একদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তখন কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করলেন যে তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম-অত্যাচার করে এবং তাঁরা একথাও বলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যে দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক কাফেরদের এ জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করে দেন"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ বক্তব্য শ্রবণ করে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাদের পূর্বকালের দ্বীনদার লোকেরা এর চেয়ে অধিক পরিমাণে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছে। তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তবু তারা তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেনি। আবার কারো কারো মাথা লৌহ শলাকার চিরুণী দিয়ে এমন ভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে গোশ্‌ত চিরে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবু তারা দ্বীন পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহর পাকের শপথ করে বলছি, এই দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবেই। এমন হবে যেদিন ছাফা পাহাড় থেকে একজন যাত্রী হাজরামাউত নামক স্থান পর্যন্ত এত নিরাপদে সফর করবে যে তার বিপদের কোন আশংকাই থাকবে না। কিন্তু তোমরা সে অবস্থার জন্যে বড় তাড়াহুড়া করছো"! (বোখারী শরীফ)

অর্থাৎ তোমরা তাড়াহুড়া করোনা, সবর অবলম্বন কর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাক। কাফেরদের তরফ থেকে যত কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, যেন কে প্রকৃত মোমেন এবং কে মুনাফেক তার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন কাফেরদের দেয়া কষ্টে বিচলিত হয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاسُ

অর্থাৎ কেউ কি ভেবেছে যে শুধুমাত্র মুখে 'আমরা ঈমান এনেছি এবং মোমেন হয়েছি' বলে দেয়াই যথেষ্ট হবে? অতঃপর তাদের আর পরীক্ষা নেয়া হবে না? এবং বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবেনা? অথচ এ দুঃখ-কষ্ট দ্বারাই তাদের ঈমানের পরীক্ষা করা হবে এবং এখলাছ ও নেফাকের পার্থক্য প্রকাশিত হবে। তাই তাদের এ ধারণা যে 'দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবেনা' সঠিক নয়, তাদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে।

পরীক্ষা তিন ভাবে হবে। প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ রোগ ও কষ্ট দ্বারা। তৃতীয়তঃ কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতন-উৎপীড়নের মাধ্যমে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"আর নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করেছিলাম"।

অর্থাৎ তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবী সঠিক কি-না তা পরীক্ষা করেছিলাম। এ পরীক্ষা

দ্বারা আল্লাহ্ পাক এ সকল লোকদের অবস্থা প্রকাশ করে দেন যারা তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবীতে সত্য এবং ঐ সকল লোকদের অবস্থাও প্রকাশ করেছেন যাদের ঈমানদার হওয়ার দাবী মিথ্যা। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক ঐ সকল লোককে সতর্ক করে দিয়েছেন যারা এ ধারণা পোষণ করেছিল যে শুধুমাত্র ঈমানের দাবী করাই যথেষ্ট হবে, এটা ভুল ধারণা। ইসলাম গ্রহণের দাবীর সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও জরুরী হয়ে পড়ে, যেন ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি পরীক্ষা না করা হতো, তবে সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী সকলেই সম পর্যায়ের হয়ে যেতো। কার মনের গভীরে সত্য আছে নাকি মিথ্যা, তা কেউ জানতে পারতো না। মোট কথা, দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা সত্য এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করার জন্যে করা হয়। পরীক্ষা করা ব্যতীতও আল্লাহ্ পাক জানেন যে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী; কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা জানে না। তাই আল্লাহ্ পাক পরীক্ষার দ্বারা দুনিয়ার মানুষকেও জানিয়ে দেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।

যেভাবে দুনিয়াতে পরীক্ষা করা হয় ভাল-মন্দ প্রকাশের জন্যে সেভাবেই ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তা প্রকাশ করার জন্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি মহব্বত রাখা, এজন্যেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্ পাককে মহব্বত করে অত্যন্ত বেশী। অতএব যে একথা বলে যে 'আমি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি' এর অর্থ হলো সে বলছে আমি আল্লাহ্ পাককে ভালবেসেছি। যদি কেউ আল্লাহ্ পাককে মহব্বত করেছে বলে দাবী করে তবে তার মহব্বতের এই দাবীর পরীক্ষা একান্ত জরুরী, যেমন মরমী কবি বলেছেন,

در محبت هرکه او دعوی کند - صد هزاران امتحان بروئے تند

گر بود صادق کشد بار جفا - گر بود کاذب گر یزدا زبلا

(যে কারো মহব্বতের দাবী করে, লক্ষ বার তাকে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে মহব্বতের দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে সে জুলুম-অত্যাচারের বোঝা বহন করে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে বালা-মছিবত থেকে সে পলায়ন করে থাকে।)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রঃ) লিখেছেন, ইমাম শা'বী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, এ আয়াত সেই মুসলমানদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে যারা মক্কা মোয়াজ্জমায় ছিলেন এবং কাফেরদের ভয়ে হিজরত করতে পারছিলেন না। যখন এ আয়াত নাজিল হলো তখন মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হিজরত না কর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই

তাঁরা হিজরত করলেন। কিন্তু কাফেররা তাঁদেরকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করলো। এরপর সাহাবায়ে কেরাম তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের সম্পর্কে এ আয়াত

الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاسُ

নাজিল হয়েছে। তখন তাঁরা পুনরায় হিজরতের জন্যে বের হলেন। কাফেররা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধ হলো, কিছু লোক শাহাদত বরণ করলেন, আর কিছু লোক মদীনা পৌঁছতে সফল হলেন।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত মদনী হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি মত রয়েছে যে এ সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় নাজিল হয়েছে।[১]

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"আর নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পূর্বকালের নবী রসূলগণকে এবং মোমেনদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বণী ইসরাঈলকে ফেরাউন বহুদিন যাবত অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ পাকের এটি একটি ব্যবস্থাপনা যে তিনি নেককার লোকদেরকে কঠিন বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, সকল উম্মতই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, এ যুগে কি সেই প্রাচীন প্রথার বরখেলাফ হবে? আর এ পরীক্ষার কারণ বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

আল্লাহ পাক অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ পাক সত্যবাদী মিথ্যাবাদী সকলকে খুব ভালভাবেই জানেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যবাদীর সত্যতা এবং মিথ্যাবাদীর মিথ্যাবাদীতাকে প্রকাশ করে দিতে চান, প্রকৃত মোমেন এবং মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য করে দিতে চান।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا

"যারা পাপকার্যে লিপ্ত, তারা কি মনে করে যে তারা আমার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে"?

আলোচ্য আয়াতে পাপকার্য বলতে শেরক ও কুফরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আমল শব্দটি যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি মনের সঙ্গেও রয়েছে এর সম্পর্ক।

اَنْ يَّسْبِقُوْنَا

অর্থাৎ তারা আমার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারব না এমনটি অবশ্যই হবেনা; বরং অবশ্যই তাদের পরীক্ষা করা হবে, যারা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৫৩-৫৪

নেককার প্রমাণিত হবে, তারা পুরস্কার পাবে, আর যারা বদকার প্রমাণিত হবে তাদের শাস্তি অবধারিত।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে মোমেনদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা একথা মনে করোনা যে তোমাদের পরীক্ষা করা হবেনা; বরং বাস্তব অবস্থা এই যে তোমাদেরকে বিপদাপদের সম্মুখীন করে অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে, যাতে করে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায়। এর পাশাপাশি ইসলামের দুশমনদেরও এ ধারণা করা উচিত হবেনা যে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন না; বরং অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। দুনিয়াতে মুসলমানদের হাতে তাদেরকে বন্দী করা হবে, হত্যা করা হবে এবং আখেরাতে তাদের জন্যে দোযখের শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

অতএব, মোমেনদের পরীক্ষার কথা শ্রবণ করে কাফেররা যেন নিশ্চিন্ত না হয়, যে মোমেনগণ ঈমান আনয়ন করা সত্ত্বেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, আর কাফেররা ঈমান না এনেও আল্লাহ পাকের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে, এমনটি কখনও হবার নয়; বরং তাদের শাস্তি মোমেনদের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"তারা যে সিদ্ধান্ত করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য"।

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের কবল থেকে কখনও রক্ষা পাবেনা।

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

এতে কাফেরদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হয়, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যে তাদের কোন শাস্তি হবেনা; বরং অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। দুনিয়াতেও তারা শাস্তি ভোগ করবে, আর আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত। এর কিছুদিন পরই বদরের যুদ্ধে কাফেররা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তি পেয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

নাজিল হয়েছে মক্কার বিখ্যাত কাফের নেতাদের সম্পর্কে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তারা হলো ওলীদ এবনে মুগীরা, আবু জেহেল, আসি এবনে হেশাম, শাইবা, ওতবা, ওলীদ এবনে ওতবা, ওতবা এবনে আবি মুয়ীদ, হানজালা এবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, যদিও এ আয়াত বিশেষ কিছু লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু তার মর্মবাণী সকলের জন্যে অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যে কেউ মন্দ কাজ করবে কাফের হোক বা মুসলিম সকলের ক্ষেত্রেই আলোচ্য আয়াতের সতর্কবাণী প্রযোজ্য

হবে, যে কেউ পৃথিবীতে অন্যায় করবে অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"যে কেউ আল্লাহ্ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষা রাখে তার জেনে রাখা উচিত যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে, তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন। সব কিছু জানেন"।

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

অর্থাৎ যারা এ আকাংক্ষা করে যে তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবে, আল্লাহ্ পাকের দীদার নসিব হবে, জীবনের প্রতিটি কাজের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে জবাবদেহী করতে হবে, তাদের জন্যে এ আয়াতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের নিদৃষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, তারা যেন নিশ্চিত থাকে, তাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হবে। তাদের মন পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং তাদের মনের সকল আশা পূর্ণ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ পাক সব কিছুই জানেন, সব কিছুই শ্রবণ করেন, তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই।

এ আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশে আখেরাতে চির শান্তি লাভের সুসংবাদ রয়েছে। অতএব, দুনিয়াতে কাফেররা যদি মোমেনদের কষ্ট দেয় তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই সমধিক কর্তব্য আর আল্লাহ্ পাক এ বিষয়েও নিশ্চয়তা বিধান করেছেন যে আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন মোমেনদেরকে আল্লাহ্ পাক পুরস্কৃত করবেন, আর মোমেন হওয়ার কারণে তাদেরকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তার বদলা বা শুভ পরিণতি দান করবেন। যেহেতু মানুষের কোন আমলই আল্লাহ্ পাকের দরবারে গোপন নেই, তাই মোমেনদের এমন কোন নেক আমল থাকবেনা, যার বদলা দেয়া হবেনা; বরং সামান্যতম নেক আমলেরও সওয়াব দেয়া হবে।

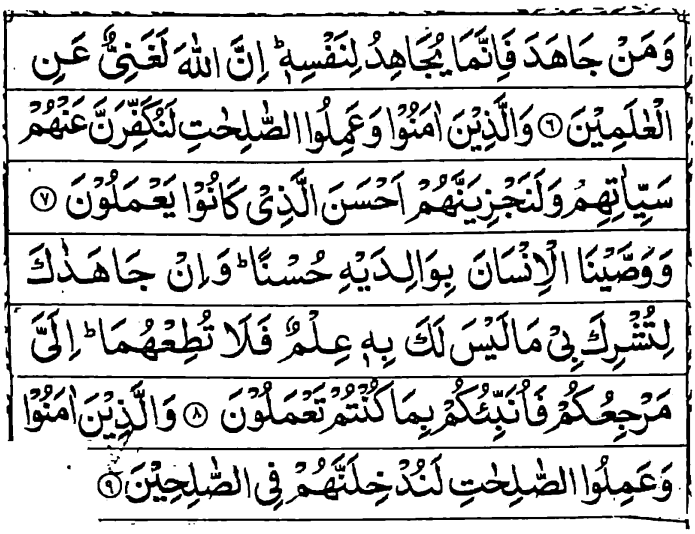
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَاِنْ جَاهَدٰكَ
لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ اِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝٩

তরজমা

(৬) আর যে সাধনা করে সে তা তার নিজের জন্যেই করে থাকে; সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহ পাক কারোরই মুখাপেক্ষী নন।

(৭) আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমি তাদের পাপ সমূহ দূরীভূত করবো এবং নেক আমল সমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময় দান করবো।

(৮) আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি এহসান করতে। তবে তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্যে বল প্রয়োগ করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। আমার নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, এরপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা কী করেছিলে।

(৯) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষা করে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনা করে তথা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে সে অবশ্যই সফলকাম হবে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহর রাহে সাধনা করে তাঁর বন্দেগী করে তবে ঐ সাধনা দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হয়, তার অক্লান্ত সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি সে নিজেই ভোগ করবে।

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

কারো এবাদত-বন্দেগীতে আল্লাহ পাকের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। যে সাধনা করে সে তার উপকারার্থেই তা করে, দুনিয়াতেও সে তার সুফল ভোগ করবে।

লক্ষ্যণীয়, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনদেরকে কঠিন পরীক্ষা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এসব কঠিন পরীক্ষা আল্লাহ পাকের কোন প্রয়োজনে নয়; বরং মানব জাতির উপকারার্থেই করা হয়। কেননা আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো নিকটই তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর দয়ার ভিখারী।

অতএব, যে কঠিন পরিশ্রম করে, অক্লান্ত সাধনা করে সে তা তার উপকারার্থেই করে। হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছেঃ সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহর বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকে, তবু খোদার খোদায়ীতে এতটুকু বাড়বেনা, পক্ষান্তরে যদি সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তবু তাঁর খোদায়ীতে, তাঁর মহান শানে এতটুকু কমবেনা।

মানুষ এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তার নিজেরই উপকার করে, আর নাফরমানী করে সে নিজেই তার ক্ষতি সাধন করে।

এরপর মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাদের গুনাহগুলো দূর করে দেব"।

অর্থাৎ তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাঁচটি নামাজ (এক নামাজ থেকে অন্য নামাজ পর্যন্ত) এবং জুমআর নামাজ পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত, রমজানের রোযা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী গুনাহগুলোকে দূরীভূত করার কারণ হয়, তবে শর্ত হলো বন্দা যদি কবীরা গুণাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে অর্থাৎ এ সময়কার সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়, যদি কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এবং নেক আমল সমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময় দান করবো"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো বন্দার আমলের চেয়ে অধিকতর পুরস্কার দান করা হবে যেমন দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত নেক আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এটি আল্লাহ্ পাকের নিতান্ত দয়া মায়া যে, তিনি বন্দাদের নেক আমলের কারণেই তার গুনাহ্ সমূহ্ মাফ করে দেন। ছোট ছোট নেক আমলের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন এবং অনেক বেশী সওয়াব দান করেন। একটি নেকীর জন্যে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব দান করেন আর মন্দ কাজকে হয়তো মাফ করে দেন, অথবা তার সমান শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ্ পাক জুলুম-অত্যাচার থেকে পবিত্র, তিনি যাকে ইচ্ছা তার নেক আমলের অনেক বেশী সওয়াব দান করেন। এজন্যে কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, কাফেররা জুলুম-অত্যাচার করলেও ভীত হওয়া উচিত নয়; বরং সত্যের উপর অটল অবিচল থাকা কর্তব্য।[১]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি এহসান করতে"। কোরআনে করীমে পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করবেনা এবং পিতার-মাতার সাথে এহসান করবে (তথা উত্তম ব্যবহার করবে)"।

অন্যত্র এ নির্দেশও রয়েছে যে, তোমরা যেন আমার প্রতি শোকরগুজার হও এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

শানে নজুল

হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সে দশজন বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর মাতার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি বণী জোহরা গোত্রের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম কবুল করলেন, তখন তাঁর মুশরেক মাতা শপথ করেন যে, যতক্ষণ সা'দ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এমনকি, ছাদের নীচে বিশ্রামও করবে না। এরপর সে সত্যি সত্যি সব কিছু ত্যাগ করে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হলো। লোকেরা বলপূর্বক তাকে পানাহার করাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, তখন এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে মাতা। কাকে রাখবেন কাকে ছাড়বেন। হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর মাতাকে বললেন, হে আমার মাতা, যদি তুমি একশতবার মৃত্যুবরণ কর এবং একশতবার জীবিত হও তবু আমি দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করবোনা। এরপর হযরত রসূলে করীম

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ২০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৫৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে অবস্থা বর্ণনা করেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বস্তুতঃ এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী, তাঁদের হক্ব সন্তানের উপর সর্বাধিক কিন্তু পিতা-মাতা যত বড় সম্মানের অধিকারীই হোন না কেন আল্লাহ পাকের চেয়ে বড় কেউ নেই, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর কোন হুকুম চলে না, চলতে পারে না।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

"তবে তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্যে বল প্রয়োগ করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না"।

অর্থাৎ পিতা-মাতা সর্বাধিক সম্মানিত এবং শ্রদ্ধাভাজন হওয়া সত্বেও যদি তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকে তবে তা মানবেনা। তারা শেরক করার কথা বললে তা সন্তানের পক্ষে মেনে নেয়া বৈধ নয়।

পিতা-মাতা এমন নির্দেশ দিলে তা অমান্য করা জরুরী হবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ স্রষ্টার নাফরমানীর মাধ্যমে সৃষ্টির অনুগত হওয়া বৈধ নয়। (আহমদ, হাকেম)

হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর মাধ্যমে কারো হুকুম পালন করা বৈধ নয়, পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হয় ভালো কাজে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হবার পর যখন হযরত সাদ (রাঃ) তাঁর মাতার নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইসলামের উপর কায়েম থাকার শপথ করলেন, তখন মাতা তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলো যে তিনি কখনো ইসলাম পরিত্যাগ করবেন না, তখন সে পানাহার আরম্ভ করে।[১]

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আমার নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, এরপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা কী করেছিলে"।

অর্থাৎ সকলকেই তার জাগতিক সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। আর একথা মনে করোনা যে আমি তোমাদের নিকট থেকে দূরে রয়েছি; বরং তোমাদের সব কিছুই আমার নখদর্পণে রয়েছে। তোমাদের যাবতীয় কথা ও কাজের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৫৫-৫৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৫৯-৬০

বিবরণ সংরক্ষিত হচ্ছে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। যদি বন্দা ঈমানদার ও নেককার হয়, তবে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, পক্ষান্তরে যদি বেঈমান ও বদকার হয়, তবে আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"যে কেউ তার আমলনামা ডান হাতে পাবে, সে তার আমলনামা পাঠ করবে, তার প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবেনা"।

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করা, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্ব রয়েছে সর্বাধিক। কিন্তু পিতা-মাতা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কথা বললে তা কখনো মানা যাবেনা, যেমন হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করবো"।

অর্থাৎ যারা অনুরূপ কঠিন পরীক্ষা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নে সুদৃঢ় থাকে এবং সত্য সাধনায় অবিচল থাকে, তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে 'সালেহীন' তথা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আলোচ্য আয়াতের 'সালেহীন' শব্দটির অর্থ হলো নবী রসূলগণ, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং শহীদগণ অর্থাৎ নেককার মোমেনদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরাম, ওলী এবং শহীদগণের সঙ্গে একত্রিত করা হবে। নেককার মোমেনদের হাশর তাঁদের সাথেই হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, তাঁদের সকলকে জান্নাতে একত্রিত করা হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সন্তান-সন্ততি যদি সত্যের উপর অবিচলিত থাকে, আর পিতা-মাতা যদি অন্যায়-অসত্যের উপরে থেকেই মৃত্যুবরণ করে, তবে সন্তান-সন্ততির হাশর হবে নেককারদের সঙ্গে। পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও আকীদার পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সে সম্পর্ক অকেজো হয়ে যায়। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ[১]

المرء مع من احب

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৫০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৫৪
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২০, পৃঃ ৩৩

যার সাথে যার মহব্বত তার সাথেই হবে তার হাশর, তাই সন্তান-সন্ততিদের হাশর হবে নেককারদের সঙ্গে।

وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ
لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا
سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ
مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ
اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

তরজমা

(১০) আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা আল্লাহ পাকের পথে নির্যাতীত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে তারা আল্লাহ পাকের শাস্তির ন্যায় গণ্য করে। আর (হে রসূল!) যখন আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলতে থাকে, "আমরা তো; তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম"। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ পাক কি সে সম্পর্কে অবগত নন?

(১১) আর আল্লাহ পাক অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, কারা মোমেন, তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মুনাফেক।

(১২) আর কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের বোঝা কিছু মাত্রও বহন করবেনা, নিশ্চয় তারা মিথ্যা কথা বলছে।

(১৩) আর তারা নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা, এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা কথা রচনা করতো, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা মুখে ঈমানদার বলে দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। যখনই কাফের মুশরেকদের তরফ থেকে তাদের প্রতি কোন জুলুম-অত্যাচার হয় তখন তারা সে বিপদকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের ন্যায় মনে করে, অথচ কেয়ামতের দিন তাদের প্রতি যে আযাব হবে তা অত্যন্ত কঠিন কঠোর, তারা কাফেরদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে ঈমানের দাবী পরিত্যাগ করে এবং মুরতাদ হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাদের প্রতি কাফেরদের তরফ থেকে কোন নির্যাতন-উৎপীড়ন হলে তারা তাতে সবর করতো না, ধৈর্যের পরিচয় দিত না এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাফেরদের কথা মেনে নিত এবং ইসলামের কথা ছেড়ে দিত। যেভাবে মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের আযাবের ভয়ে আখেরাতের চিন্তায় আল্লাহ্‌র নাফরমানী তথা কুফর ও শেরক পরিত্যাগ করে, তেমনি মুনাফেকরা মানুষের নির্যাতনের ভয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করতো।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মক্কার মুসলমানগণকে যখন এ আয়াতের অবতরণ সম্পর্কে মদীনার সাহাবাগণ সংবাদ দিলেন, তখন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আমরা অবশ্যই মদীনা শরীফ চলে যাব। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তবে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়ঃ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا

তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণ মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট এ আয়াত লিখে চিঠি দিলেন। চিঠি পাঠ করা মাত্র তাঁরা মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন, কাফেররা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং পথে লড়াই হলো, কিছু লোক শহীদ হলেন আর কিছু লোক জীবিত রইলেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে সব লোকদের সম্পর্কে যাদেরকে মুশরেকরা মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মুনাফেকরা মৌখিকভাবে ঈমানদার হলেও প্রকৃত অবস্থায় ঈমানের উপর সুদৃঢ় ছিল না, এজন্যে যখনই তাদের উপর ঈমানের দাবীর কারণে কোন বিপদ এসেছে, তখনই তারা ঐ বিপদকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের ন্যায় কঠিন মনে করে এবং ঐ বিপদকে ভয় করে ঈমান পরিহার করেছে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফেকদের এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যখন মুসলমানদের বিজয় লাভ হতো, তখন তারা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৫১

নিজেদেরকে বিজয়ের অংশীদার বলে জাহির করতো। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

(হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন সাহায্য উপস্থিত হয়, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। অর্থাৎ যখন তারা মুসলমানদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি দেখতে পায় তখনই তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথী মুসলমান, আমরা কি কখনো পর হতে পারি! বিশেষতঃ জেহাদে যখন মুসলমানগণ বিজয় লাভ করতেন, তখন তাদের এসব খোশামোদপূর্ণ কথাবার্তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় হতো। আল্লাহ পাক তাদের একথার জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

"বিশ্ববাসীর মনের গহনে কি রয়েছে তা কি আল্লাহ পাক জানেন না"?

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের যাবতীয় কথাবার্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কে প্রকৃত মোমেন আর কে মুনাফেক তিনি তা ভালভাবেই জানেন। মুসলমানদের সঙ্গে কাদের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, আর কারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তাই যারা মুনাফেক, তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। আর যারা মোমেন, তাদের প্রাপ্য পুরস্কার অবশ্যই তাদেরকে দেয়া হবে, কাজেই যারা মৌখিক ভাবে ঈমানের দাবীদার হয়ে বাজীমাত করতে পারবে বলে ধারণা করে, তাদের ব্যর্থতা অবধারিত এবং তাদের শাস্তি অনিবার্য।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

"আর আল্লাহ পাক অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মোমেন এবং তিনি অবশ্যই একথাও প্রকাশ করে দেবেন যে কারা মুনাফেক"।

অর্থাৎ কে প্রকৃত মোমেন আর কে মুনাফেক তা আল্লাহ পাক জানেন, কিন্তু তিনি মানুষের সম্মুখে মুনাফেকদের মুখোশ খুলে দেবেন যাতে করে তারা মানুষকে প্রতারণা করতে না পারে।

অথবা এর অর্থ হলো, কে মুনাফেক এবং মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ পাকের অজানা নয়; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ পাক মানুষকে তাদের মুনাফেকী দেখিয়ে দিতে চান। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন, আল্লাহ পাক মোমেন ও মুনাফেকদের মধ্যকার পার্থক্যকে প্রকাশ করে দিতে চান, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃঃ ৩৩৩

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মানুষ তিন প্রকারঃ

(১) মোমেন, যাদের ঈমান ও আকীদা সুস্পষ্ট, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং ঈমান মোতাবেক আমল করে।

(২) কাফের, যারা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত, তাদের কুফর ও শেরক প্রকাশ্য।

(৩) মুনাফেক, যারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে অথচ অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। তারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে থাকে, কখনও মোমেনদের সঙ্গে, কখনও কাফেরদের সঙ্গে।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেন ও কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনার পর এ আয়াত থেকে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ঈমানের কারণে যখন কোন বিপদ দেখা দেয় তথা কাফেরদের তরফ থেকে তাদেরকে নির্যাতন করা হয় তখন তারা ভীত হয়ে ঈমান পরিত্যাগ করে। অথচ মোমেনের কর্তব্য হলো ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকা এবং জান মাল, যথা-সর্বস্ব কোরবাণ করেও ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা। কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে কিন্তু ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করেও এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের উপর অবিচল থাকা মোমেনের কর্তব্য।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ

"আর কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো"।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেন যে, মক্কার কাফেররা একথা বলেছিল। কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেনঃ আবু সফিয়ান মোমেনদেরকে বলেছিল, আমাদের এবং আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের উপর চল। কুফরী কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই তারা এমন কথা বলেছিল।

ফররা (রঃ) বলেন যে এর অর্থ হলো, যদি তোমরা আমাদের পথে চল তবে তোমাদের গুনাহর দায়িত্ব আমরা বহন করবো।

وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"প্রকৃতপক্ষে কাফেররা তাদের বোঝা কিছু মাত্রও বহন করবেনা, নিশ্চয় তারা মিথ্যা কথা বলছে"।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ

"আর তারা নিজেদের পাপের বোঝা বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা"।

অর্থাৎ অন্যদেরকে গোমরাহ করার গুনাহর বোঝা। অবশ্য এর দ্বারা যারা গোমরাহ হবে তাদের বোঝা হালকা হবে না।

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

"আর তারা যে সকল মিথ্যা কথা রচনা করতো, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কাফেরদের কথা বলা হয়েছে তারা হলো মক্কার মুশরেক আবু জেহেল এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। তারা হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত সালমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিল, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে দুঃখ-যাতনা ভোগ করছো, এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছো, আমাদের কথা মেনে চল, মূর্তি পূজায় আমাদের অনুসরণ কর, যদি এতে কোন পাপ হয় তবে কেয়ামতের দিন আমরা নিজেরাই সে পাপের বোঝা বহন করবো, পাপের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দাও"।[১]

বস্তুতঃ তাদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা। তারা পাপের বোঝা বহনের কথা বলে তাদের পাপের বোঝা আরও বাড়িয়ে নিচ্ছে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের আহবান জানায় কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক সেই হেদায়েত মোতাবেক চলবে তাদেরকে যত সওয়াব দেয়া হবে তা একা ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, আর তাদের সওয়াব কমানো হবে না। ঠিক এভাবে যে দুনিয়াতে মন্দ কাজের আহবান জানায় এবং মন্দের প্রসার ঘটায়, যত লোক সেই মন্দ কাজ করে তাদের যা গুনাহ হবে ঐ ব্যক্তির একা সেই গুনাহ হবে। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এরপর পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে যত হত্যাকান্ড হচ্ছে, সকল হত্যাকান্ডের মধ্যে তার গুনাহ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কেননা সর্ব প্রথম সে-ই অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রেসালতের হক্ব আদায় করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা জুলুম করা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, "আমার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আজ একটি জুলুমও বাদ দেবনা"। এরপর একজন ঘোষণা করবে, "অমুক কোথায়"? সে ব্যক্তি হাযির হবে। এভাবে একেক ব্যক্তি পর্বত পরিমাণ নেক আমল নিয়ে আসবে, এমনকি হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়বে, আর আল্লাহ পাকের দরবারে সে বন্দা দন্ডায়মান হবে, তখন ঘোষক ঘোষণা করবে, "এ ব্যক্তির নিকট কারো কোন হক্ব থাকলে সে আসুক এবং তার হক্ব নিয়ে নিক"। তখন এদিক সেদিক থেকে অনেক লোক আসবে, তারা তাকে ঘিরে ফেলবে, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'আমার এ বন্দাদের হক্ব আদায় করা হোক"। ফেরেশতাগণ আরজ করবে, "হে আল্লাহ! কিভাবে তা আদায় করবো"? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন– "এ ব্যক্তির নেকীগুলো নিয়ে পাওনাদারদেরকে দিয়ে দাও"। তাই

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃঃ ৩৩৩

করা হবে এমনকি, এ ব্যক্তির একটি নেকীও থাকবে না, অথচ তখনও কিছু হক্বদার বাকী থাকবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'তাদেরও বদলা দিয়ে দাও"। ফেরেশতাগণ আরজ করবে, "এ ব্যক্তির আর একটিও নেকী অবশিষ্ট নেই"। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ "এদের গুনাহগুলো তার উপর চাপিয়ে দাও"। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ

তেলাওয়াত করেন।[১]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ
اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾
فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾
وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا
عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

তরজমা

(১৪) এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করি। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করে। এরপর তুফান তাদেরকে আক্রমণ করে, কেননা তারা ছিল জালেম।

(১৫) এরপর আমি তাকে এবং যারা জাহাজে আরোহন করেছিল তাদের সকলকে রক্ষা করলাম। আর বিশ্ববাসীর জন্যে জাহাজটিকে (অথবা এ ঘটনাকে) নিদর্শন করে রাখি।

(১৬) আর স্মরণ কর ইব্রাহীমের কথা যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, "তোমরা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৫২

এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্যে এটিই উত্তম যদি তোমরা তা বুঝতে পার"।

(১৭) তোমরা তো আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এ মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং মিথ্যা কথা রচনা করছো, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা রিয্‌কের মালিক নয়, অতএব তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকটই রিয্‌ক চাও এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁরই নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেন, কাফের-মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার পর মোমেনদের জন্যে সওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে এবং কাফের ও মুনাফেকদের জন্যে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর কাফের ও মুনাফেকদের যে অন্যায় আচরণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে হচ্ছিল তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে বহু নবী-রসূলগণ আগমন করেছেন, কাফের-মুশরেক, বে-দ্বীনরা তাঁদেরকেও এভাবে কষ্ট দিয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনদের প্রতি কাফেরদের নির্যাতনের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াত সমূহে অন্যান্য নবী রসূলগণের যুগে কাফের-মুশরেকরা যে অন্যায় আচরণ করতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রায় এক হাজার বছর অব্যাহত ছিল, হযরত নূহ (আঃ)-কে এ সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যধিক ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয়েছে। কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার এবং ঔদ্ধত্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তিনি আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক একটি জাহাজ নির্মাণ করেন এবং স্বল্প সংখ্যক সঙ্গীদেরকে নিয়ে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন। এভাবে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে রক্ষা করেন এবং কাফের-মুশরেকদেরকে ধ্বংস করে দেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মোহাজের সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, পূর্বকালে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহাবীগণ ইসলামের প্রচারে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করেছেন। অতএব, আজ যদি কাফের-মুশরেকরা মোমেনদেরকে কষ্ট দেয়, তবে কারো মন আহত হওয়া উচিত নয়। কেননা যুগে যুগে সত্যের দুশমনরা সত্যের অনুসারীদেরকে চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রায় এক হাজার বছর ধরে কাফেরদের জুলুম সইতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গীদেরকেও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আর কষ্টের পরই আসে আরাম। তাই এরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

"আর নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করি, সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করে। এরপর তুফান তাদেরকে আক্রমণ করে, কেননা তারা ছিল জালেম"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, চল্লিশ বছর বয়সে হযরত নূহ (আঃ) নবুওয়্যত লাভ করেছেন। এরপর সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাঁর জাতিকে হেদায়েত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর জাতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, শুধু তাই নয়; বরং তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। এরপর হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রলয়ংকরী বন্যা দিয়ে ধ্বংস করে দেন। এরপরও হযরত নূহ (আঃ) ষাট বছর জীবিত ছিলেন। এভাবে তাঁর বয়স হয় এক হাজার পঞ্চাশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবনে আবি শায়বা, আবদ এবনে হামিদ, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং হাকেম। এবনে মরদবিয়াও একথার উল্লেখ করেছেন। ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল এক হাজার চারশত বছর। অবশেষে মৃত্যুদূত তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন, হে সুদীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত নবী! আপনি দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বলেন, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো এমন, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ি নির্মাণ করলো, তার দুটি দ্বার রেখেছে তার একটি দিয়ে সে প্রবেশ করেছে, অন্যটি দিয়ে সে বের হয়ে এসেছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবস্থান কালের কথা কেন উল্লেখ করা হয়েছে? এর জবাবে তারা বলেছেন, এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত হযরত নূহ (আঃ) দ্বীন ইসলামের তবলীগ করেছিলেন এবং কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে সবর করেছিলেন, প্রায় হাজার বছর ধরে তাদের যাবতীয় চক্রান্তের মোকাবেলা করেছিলেন। এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্যে, যাঁদের প্রতি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর অকথ্য নির্যাতন করা হয় এবং হিজরতের পর মদীনা মোনাওয়্যারায় কাফেরদের বিরুদ্ধে দশ বছরে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে।[১]

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃঃ ১৫৫
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১৪২-৪৩
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৬৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৭
হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৮, পৃঃ ২৭৫ এবং তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১২, পৃঃ ৪৩-৮২

"আর স্মরণ কর ইব্রাহীমের কথা, যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, "তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্যে এটি উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলেন। কেননা তাঁর জাতি স্বহস্তে মূর্তি নির্মাণ করতো এবং তাদের পূজা করতো। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার এবং তাঁকে ভয় করার আহবান জানান। কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি, তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। সে যুগের জালেম রাজা নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ পাক সে অগ্নিকুন্ডকে গুলবাগে পরিণত করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় সত্য গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেছেন,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا

তোমরা তো আল্লাহ পাক ব্যতীত এ মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং মিথ্যা কথা রচনা করছো, নিজের হাতে গড়া বস্তুকে পূজনীয় মনে করা বা সেগুলোর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা কত অযৌক্তিক, কত অসুন্দর এবং কত হাস্যাস্পদ তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এরপর তাঁর জাতিকে মানব জাতির সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু হলো তার রিয্‌ক, যারা রিয্‌কের ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনা, এ সম্পর্কে যাদের কোন ক্ষমতাই নেই, এ জড় পদার্থ যা মানুষের কোন উপকারই করতে পারেনা, তাদের উপাসনা করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নয়, তাই এরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

"আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা রিয্‌কের মালিক নয়"।

অতএব, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, রিয্‌কদাতা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি ভাগ্য-নিয়ন্তা, তাঁর নিকট তোমরা নিজেদের রিয্‌ক চাও, অপদার্থ প্রাণহীন জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত করোনা।

فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের নিকটই রিযক চাও এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতএব, মানব জাতির জীবন-সাধনার সাফল্য হলো তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনে, এক আল্লাহর বন্দেগীতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায়, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর শোকর গুজারীতে, এতেই রয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ। কেননা প্রতিটি মানুষকে অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং তার জীবনের

যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আর তোমাদের প্রত্যেককে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ
قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৮) আর তোমরা যদি (আমাকে) মিথ্যা জ্ঞান কর, তবে জেনে রেখ তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (নবী রসূলগণকে) মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। সুস্পষ্ট ভাবে সত্য প্রচার করাই রসূলের কাজ।

(১৯) তারা কি লক্ষ্য করেনা? কিভাবে আল্লাহ পাক প্রথম বার সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, এরপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তা আল্লাহ পাকের জন্যে অতি সহজ।

(২০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য করে দেখ, কিভাবে আল্লাহ পাক সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন, এরপর আল্লাহ পাক পুনরায় শেষ বারও সৃষ্টি করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(২১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা দয়া করেন এবং তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের বিবরণ ছিল। যারা তৌহীদে বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে মানেনা, নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয় না, তাদের

শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ

"আর তোমরা যদি (আমাকে) মিথ্যা জ্ঞান কর, তবে জেনে রেখ তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (নবী রসূলগণকে) মিথ্যা জ্ঞান করেছিল"।

তফসীরকারগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি কার?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু ইতোপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা বর্ণিত হয়েছে তাই এ বক্তব্যটি তাঁরই, তিনি তাঁর জাতিকে বলেছেন, যদি তোমরা আমাকে আল্লাহর রসূল হিসাবে বিশ্বাস না কর এবং আমার আহবানে সাড়া না দাও তবে তোমরাই এর পরিণতি ভোগ করবে, আমার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা আমি আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূল, আর রসূলের কাজ হলো শুধু মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া, আর আমি এ দায়িত্ব পালন করেছি।

ইমাম রাজী (রঃ) আরও বলেছেন, এ বক্তব্যটি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরও হতে পারে। তিনিই কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল মনোনীত হয়ে এসেছি, যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান কর তবে মনে রেখো এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, আর তোমাদের এ মিথ্যা জ্ঞান নতুন কিছু নয়, কেননা ইতোপূর্বে যে নবী রসূলগণ আগমন করেছেন তাঁদেরকেও মিথ্যা জ্ঞান করা হয়েছিল। মূলতঃ নবীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী তাঁর বন্দাগণের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ দায়িত্ব আমি পালন করেছি। যদি তোমরা আমার আহবানে সাড়া না দাও তবে তার পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। অতীতেও আদ জাতি, ছামুদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবীর কথা মানেনি, পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হয়েছে। যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও, তবে তার পরিণাম ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কার কোরায়েশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অন্যায় আচরণ করতো। এজন্যে আযাবের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার মধ্যে একথা আলোচনার উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া, অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার ন্যায় আপনার পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-এরও এ অবস্থা হয়েছিল। তাঁর জাতির পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং তারা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

"তারা কি লক্ষ্য করেনা? কিভাবে আল্লাহ পাক প্রথম বার সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, এরপর তিনিই তা পুনরায় সৃষ্টি করেন"।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃঃ ৪৫

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন, এরপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন, এ কথার তাৎপর্য হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা।

অথবা এর তাৎপর্য হলো, ফল-মূল এবং শস্য-শ্যামলিমাকে যেমন ইতোপূর্বে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি পুনরায় তা সৃষ্টি করা।

إِنَّ ذٰلِكَ

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়; বরং অত্যন্ত সহজ।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য করে দেখ, কিভাবে আল্লাহ পাক সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন"।

অর্থাৎ তোমরা সারা পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে দেখ, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-তরুলতা এসব কিছু আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করেন, এসবই আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন, তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি 'হও' বললেই হয়ে যায়, আর কোন কিছুরই প্রয়োজন হয়না।

মোট কথা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক কিভাবে মানুষকে শূণ্য থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। একদিন তাদের কোন অস্তিত্ব ছিলনা, আর আল্লাহ পাকই তা সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং কেয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করবেন, আর এটি আল্লাহ পাকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা।

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ

"তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি রহমত করবেন, আর তোমরা সকলে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে"।

অর্থাৎ আখেরাতে দোযখের শাস্তি দেবেন। অথবা দুনিয়াতে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে বা দুনিয়ার প্রতি লোভী করে অথবা চারিত্রিক দুর্বলতা দিয়ে অথবা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ করে অথবা বেদআত ও বে-শরীয়তী কাজে লিপ্ত করে তাকে শাস্তি দেবেন। এসবই হলো আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হবার পন্থা। আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার প্রতি রহমত করেন, অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার প্রতি দয়া করবেন, অথবা দুনিয়াতে সাহায্য করে বা অল্পে তুষ্টির গুণ দিয়ে, চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী করে, আল্লাহ পাকের প্রতি আকৃষ্ট করে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের তৌফিক দিয়ে তার প্রতি দয়া করবেন এবং এসবই হলো আল্লাহ পাকের রহমত লাভের পন্থা।

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

"আর তোমরা সকলে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে"।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক আখেরাতে মানুষকে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যেককে হাযির হতে হবে, সেদিন তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া করবেন, আর তা করবেন তাঁর নিজস্ব বিবেচনা মোতাবেক। এতে কারো কোন আপত্তি করার অধিকার থাকবেনা।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ পাক কাফের অবস্থায় মৃত্যু দেবেন এবং এরপর শাস্তি দেবেন। এমনিভাবে যার প্রতি দয়া করতে চান, তাকে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দেবেন এবং তার প্রতি দয়া করবেন। আর তোমরা সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যাবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় তিনি তোমাদেরকে দান করবেন।[২]

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَمَا
لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى
وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ
إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২২) আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

(২৩) আর যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর মোলাকাতকে অস্বীকার করে তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় এবং তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

(২৪) এরপর একথা ব্যতীত তাঁর জাতির কোন জবাব ছিল না যে, 'ইব্রাহীমকে মেরে ফেল বা পুড়িয়ে দাও'। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা ঈমান রাখে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৬৬
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃঃ ৩৩৩

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তৌহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে"।

কোন দূরাত্মা কাফের-মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবোনা, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমনি এ ইচ্ছাও কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

"আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ্ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা"।

একথার তাৎপর্য হলো, যদি কেউ আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। এক, পলায়ন করার মাধ্যমে। দুই, হাযির থেকে আযাব মোকাবেলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে পৃথিবীতে এমন কোন সৃষ্টি নেই যে আল্লাহ্ পাকের আযাবের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা যায় না। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ জমীনের উপর এমন কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহর পাকের আযাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

وَلَا فِي السَّمَاءِ

জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে যদি কেউ (রকেটে আরোহন করে) আসমানে তথা মহাশূণ্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোন স্থানই আল্লাহ্ পাকের কাছে গোপন নেই। অতএব কোন অপরাধীই আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। প্রকাশ্যে যারা সাহায্যকারী বলে পরিচয় দেয়, অবশেষে তারা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর

কুদরতের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় অক্ষম। আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন الارض শব্দটিকে السماء শব্দটির পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা স্বভাবতঃ কোন অপরাধী যদি পলায়ন করতে চায় তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীতেই পলায়নের চেষ্টা করবে। যদি সারা পৃথিবীতে কোন গোপন স্থান না পাওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে মহাশূণ্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রথমে الارض এবং পরে السما ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ মুশরেক হোক কি মুরতাদ তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, জমিন আসমান কোথাও না। ত্রিভূবনে এমন কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহর কোন দুশমন আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যারা আল্লাহর দুশমন বা আল্লাহর কোরআনের দুশমন, আসমান জমিনে তাদের জন্যে পলায়নের কোন স্থান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

"আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক বা বন্ধু নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই"।

অর্থাৎ আসমানী জমিনী বালা-মছিবত থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নেই, আর তিনিই যখন রক্ষা করবেন না তবে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়াতে কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।

একথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু তাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারী নেই, তাই জমিনে বা আসমানে এমন কেউ নেই যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে, জমিনে বা আসমানে কোথাও কাফেরদের জন্যে পলায়নের বা আত্মগোপন করার কোন আশ্রয়-স্থল নেই, যেখানে তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং আযাবকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারে। আর এ আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বাঁচতে পারবেনা তাই নয়, তাদের এমন কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আসমানী জমিনী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। কাফের মুশরেক, মুরতাদ, নাস্তিকদের মানুষের হাত থেকে হয়তো অন্য মানুষ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারেনা; বরং যারা এমন হতভাগাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তারাও ধ্বংস হয়।[২]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃঃ ৪৯-৫০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১৪৯

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে (১) তৌহীদ ও (২) আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে, "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবেনা এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর আযাব"। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তৌহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কেয়ামতের দিনেও বিশ্বাস করেনা তারাই সে সব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শেরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে। আর যে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা

যারা আল্লাহ পাকের কথা মানেনা, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে, আখেরাতে বিশ্বাস রাখেনা এবং একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাযির হতে হবে- একথাও বিশ্বাস করেনা, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করেনা। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর একথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ জান্নাত, অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, কেননা কাফের-মুশরেক-মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করেনা, কেয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখেরাতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তথা জান্নাত থেকে হবে মাহরুম। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মোমেনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতের প্রতি তথা আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব

উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন।

رَحْمَتِي

অর্থাৎ আমার রহমত।

পক্ষান্তরে আযাবের ঘোষণায় এরশাদ করেছেনঃ

لَهُمْ عَذَابٌ

অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে আযাব।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আযাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম।[১]

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

"এরপর একথা ব্যতীত তার জাতির কোন জবাব ছিল না যে, ইব্রাহীমকে মেরে ফেল অথবা পুড়িয়ে ফেল, এরপর আল্লাহ পাক তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন"।

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দরদ ভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশে পেশ করেছিলেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি তাঁর এসব কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে ওঠে, তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা বলে আমাদের একই দাবী হয় ইব্রাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুতঃ যারা যুক্তি তর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা তারা এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি করেছিল।

فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক বিশাল অগ্নিকুন্ড তৈরী করে তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্নিকে নির্দেশ প্রদান করলেন,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"আমি বললাম, "হে অগ্নি! তুমি শীতল হও এবং ইব্রাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক হও"।[১]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক কিভাবে তাঁর প্রিয় বন্দাগণের হেফাজত করেন তার একটি দৃষ্টান্ত

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২০, পৃঃ ১৪৯
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরাআন, খন্ড-১৭, পৃঃ ৮৪-৯৪

রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরুদের তৈরী করা অগ্নিকুন্ড পোড়াতে পারেনি, কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারেনা, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারেনা।

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم
مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৫) ইব্রাহীম আরও বললো, তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, এরপর কেয়ামতের দিন তোমরাই আবার একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে লা'নত করতে থাকবে, দোযখই তোমাদের আবাস-স্থল এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

(২৬) লূত তার প্রতি ঈমান আনলো। আর ইব্রাহীম বলে, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২৭) আর আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং তাদের বংশে রেখে দিলাম নবুওয়্যত ও কিতাব; অধিকন্তু তাকে দুনিয়াতে আমি পুরস্কৃত করেছিলাম, আর নিশ্চয় সে আখেরাতে নেককারদের অন্যতম হবে।

(২৮) (আর লূতকে আমি পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করলাম) স্মরণ কর সে সময়কে যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা এমন অশ্লীল আচরণ করছো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি"।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন নিরাপদে অগ্নিকুন্ড থেকে বের হয়ে আসলেন তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপদেশের বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোন সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক, অসুন্দর কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছ। এর পেছনে কোন যুক্তি যে নেই একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তি পূজা করছো। অথচ কেয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয়, কেয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যেকে লা'নত দেবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি-অনুরক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অপব্যবহারই মূর্তি পূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন পর তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন-কল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পেছনে কোন যুক্তি নেই, বরং একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখতে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

وَّمَاوٰكُمُ النَّارُ

"আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোযখ"।

অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা হবে দোযখ।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ

"আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যারা তোমাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে"।

অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার উদ্দেশে, পরস্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তি পূজা কর, মনে রেখো! তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই, এরপর এ সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষতঃ কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের পরস্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

(কেয়ামতের দিনে একে অন্যের বিরোধিতা করবে আর একে অন্যকে লা'নত দেবে)

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ

"লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলেন"।

লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতস্পুত্র। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম লূত (আঃ)-ই বিনা দ্বিধায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাই 'হারান'। তিনি মা'ছুম ছিলেন। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের অন্য লোকদের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান করেননি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হিজরত

وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ

"হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আমি আল্লাহ পাকের নির্দেশিত স্থানের দিকে হিজরত করছি"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। আল্লাহ পাক আমাকে যেখানে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন আমি সেখানে চলে যাব। অথবা যেখানে আমার প্রতিপালকের এবাদত সহজ হবে সেখানে আমি চলে যাব। অথবা এর অর্থ হলো, আমি আমার জাতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। তাদের সঙ্গে আমার কোন দ্বীনি সম্পর্ক থাকবে না। আমি আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করবো অর্থাৎ সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করবো।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কূফা থেকে হেরানের দিকে হিজরত করেন। এরপর হেরান থেকে সিরিয়া চলে যান। এ সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভ্রাতস্পুত্র লূত (আঃ) এবং স্ত্রী হযরত সারা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাহে দেশ ত্যাগ করেছেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনে এবং হযরত লূত (আঃ) সদূমে বাস করেন। তফসীরকারগণ বলেছেন, হিযরতের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ)

আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর পর ওসমান সর্বপ্রথম মোহাজের। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত ওসমান (রাঃ) সর্বপ্রথম হিজরত করেন। হযরত যায়েদ এবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, লূত এর পর ওসমান এবং রুকাইয়ার পূর্বে আর কেউ মোহাজের হয়নি।[১]

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, যিনি আমার হেফাজত করেন, আর তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি আমাকে এমন কাজের তওফিক দান করেন, যাতে রয়েছে আমার সার্বিক কল্যাণ"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, নমরূদ যখন দেখলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পূর্ণ নিরাপদে অগ্নিকুন্ড থেকে বের হয়ে এসেছেন, তখন সে তাঁর নিকট আবেদন করলো যে আপনি দয়া করে এদেশ ছেড়ে চলে যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ মোতাবেক তার এ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং স্বদেশ থেকে হিজরত করলেন। তাঁর জাতির নাফরমানীর কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করলেন এবং সকল আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে সরে পড়লেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর বৃদ্ধকালে এসহাকের ন্যায় পুত্র এবং ইয়াকুবের ন্যায় পৌত্র দান করলেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

"আর আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং তার বংশে নবুওয়্যত রেখে দেই এবং আসমানী কিতাব দান করি; আর তাকে পৃথিবীতেই উত্তম বিনিময় দান করি; আর নিশ্চয় সে আখেরাতেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হিজরতের পর সিরিয়ায় সুসন্তান দান করেন যাতে করে তাঁদেরকে দেখে তাঁর নয়ন-মন তৃপ্তি লাভ করে।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; কারণ এ হিজরতের সফরে তাঁরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁদেরকে ইতোপূর্বেই মক্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসা হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-এর চৌদ্দ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

মোটকথা, হিজরতের পর আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নেক সন্তান দান

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৬৮-৬৯

করেন এবং একথাও এরশাদ করেন যে আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে নবুওয়্যত এবং আসমানী কিতাব রেখে দিয়েছি।

অর্থাৎ আগামীতে যাঁরা এ নবুওয়্যতের নেয়ামত ও আসমানী কিতাব লাভ করবেন তাঁরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরই হবেন।

সুতরাং নবুওয়্যত প্রথম পর্যায়ে বণী ইসরাঈলে (ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশ-ধারায়) ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে বণী ইসমাঈলে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই নবুওয়্যতের আগমন ধারা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে তৌরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং কোরআন এই সকল কিতাব সমন্বিত ভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশেই নাজিল হয়।

আর যেহেতু ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর তাঁর বংশেই নবুওয়্যত ও রেসালত সংরক্ষিত ছিল তাই তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা নবীদের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর তাঁর বংশ ব্যতীত একজন নবীও অন্য কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেননি, এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا

"আর আমি তাকে দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় দান করেছি"।

অর্থাৎ দুনিয়াতে বৃদ্ধ কালে তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ছিল। এমনিভাবে নবুওয়্যত ও রেসালত তাঁর বংশে সংরক্ষিত থাকা তাঁর প্রতি মহা-সম্মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার সুদ্দী (রঃ)।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় বা اجر এর অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে সর্বদা নবুওয়্যত ও রেসালত সংরক্ষিত থাকা, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ সকলের নিজেদের ধর্মকে দ্বীনে ইব্রাহীমী দাবী করা এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা, যেমন নামাজের তাশাহহুদের শেষে তা উল্লেখ করা হয়।

وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ নেয়ামত

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, যা কিছু ইতিপুর্বে উল্লেখিত হয়েছে তা ছাড়াও আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে নেয়ামত দান করেছিলেন তা হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকর করার তওফিক এবং আল্লাহ পাকের এবাদতে তিনি বিশেষ স্বাদ লাভ করতেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৬৯-৭০

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন সে সম্পর্কে মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুন্ড থেকে নাজাত দেয়া এবং জালেম নমরূদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করা।

তফসীরকার এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে উত্তম বিনিময় দান করেছেন তা হলো বৃদ্ধকালে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বংশেই নবুওয়্যত সংরক্ষিত রাখা।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, সে নেয়ামত হলো তিনি দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতেই যে বিনিময় দান করেছেন তা হলো আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের তওফিক।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্মান এবং মর্যাদা শুধু যে দুনিয়াতেই রয়েছে তা নয়; বরং আখেরাতেও তিনি শীর্ষস্থানীয়, মহা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সম্বর্ধনা লাভ করবেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি এটি আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত বড় নেয়ামত যে তৌহীদ ও আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রচার-প্রসারে তাঁর বংশধরগণ যুগ যুগ ধরে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অতি ভাগ্যবান, আর আখেরাতে তিনি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নৈকট লাভে ধন্য হবেন।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক যদি দুনিয়াতে তাঁর কোন প্রিয় বন্দাকে কোন বিশেষ নেয়ামত দান করেন তবে তা তাঁর আখেরাতের মরতবা কম করার কারণ হয় না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে তা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।[৩]

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি লূতকে (পয়গম্বর মনোনীত করে) প্রেরণ করি। স্মরণ কর সে সময়কে যখন সে তার জাতিকে বলে, "তোমরা এমন এক অশ্লীল আচরণ করছো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি"।

হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে হিযরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে 'সদূম' নামক শহর এবং তার উপকণ্ঠের জন্যে নবী করে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২২, পৃঃ১৫২-৫৩
২। তফসীরে মাজেদী, পৃঃ ৮০৫
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃঃ ৭৮৩

"তোমরা এত অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছ যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি"।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ
فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا
ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ
انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ
اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ
الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا
لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ؗ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ
اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

তরজমা

(২৯) (হযরত লুত (আঃ) আরও বলেন) তোমরাই তো পুরুষে উপগত হও, তোমরাই তো ডাকাতি, রাহাজানি করে থাক, তোমরাই তো নিজেদের সভায় প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হও। জবাবে তাঁর সম্প্রদায় শুধু একথা বললো যে, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(৩০) লূত বললো, "হে আমার প্রতিপালক! অশান্তি সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন"।

(৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসলো, তখন তারা বলেছিল, আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো, কেননা এর অধিবাসীরা জালেম।

(৩২) ইব্রাহীম বললো, "এ জনপদে তো লূত রয়েছে"। তারা বললো, "সেখানে কারা আছে আমরা তা ভালভাবেই জানি, আমরা লূতকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করবো। তার স্ত্রী ব্যতীত, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।

তফসীরুল কোরআন

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের জঘন্য অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা জঘন্যতম ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো, তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ করতো, শুধু তাই নয়; তারা ডাকাতি-রাহাজানি করতো, মানুষের পথ রোধ করে তাদের অর্থ সম্পদ লুট করতো।

وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ

"তোমাদের আসরে তোমরা অশ্লীল ও ঘৃণ্য কুকর্মে লিপ্ত থাক"।

তারা পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল। তাই তারা প্রকাশ্যে এবং সকলের সম্মুখে এমন ঘৃণ্য ও অশ্লীল কাজ করতে আদৌ লজ্জা বোধ করতো না।

আল্লামা বগভী হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি এবং আরজ করেছি, তারা কোন্ মন্দ কাজটি করতো? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তারা সদর রাস্তার উপরেই তাদের সভা অনুষ্ঠান করতো, মানুষের গতিরোধ করতো, তাদের দেহে প্রস্তর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপ করতো। (আহমদ তিরমিজী)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে লূত সম্প্রদায় সদর রাস্তার উপর তাদের আসর জমিয়ে বসতো, প্রত্যেকের নিকট একটি পাত্র থাকতো, তাতে ছোট ছোট পাথর রাখা হতো, যখন কোন পথচারীকে দেখতো, তখন একে অন্যকে বলতো শিকার কর। এরপর ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতো। যার পাথর ঐ ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করতো, ঐ পথিক প্রস্তর নিক্ষেপকারীর হয়ে যেত তখন সে তার সব ধন-সম্পদ লুট করতো, এরপর সে তার সাথে অশ্লীল কাজ করতো, অবশেষে তাকে মাত্র তিন দেরহাম দিয়ে বিদায় দিত।

কাসেম এবনে মোহাম্মদ বলেছেন, তারা প্রকাশ্য সভায় বসে উচ্চস্বরে উদরের বাতাস বের করতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রতি থুথু দিত।

মাকহুল (রঃ) বলেছেন, তারা মজলিসের মধ্যেই নগ্ন হয়ে যেত, মানুষের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতো এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। তাই হযরত লূত (আঃ) এ দুবৃত্তদের হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণে রাজি হয়নি; বরং তারা লূত (আঃ)-কে বলেছে, তোমার এসব উপদেশ রাখ, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর আযাব নিয়ে আস, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু একথা বললো যে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে

আস, যদি তুমি সত্যবাদী হও"।

অর্থাৎ তুমি যে আযাবের হুমকি দিচ্ছ তা নিয়ে আস, যদি তুমি তোমার নবুওয়্যতের দাবীতে সত্যবাদী হও, অথবা আযাবের দাবীতে সত্যবাদী হও, অথবা আমাদের কর্মকে মন্দ বলার ব্যাপারে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্ পাকের আযাব নিয়ে আস।[১]

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

"লূত বললো, "হে আমার প্রতিপালক! এ অশান্তি সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তদের উপর আযাব নাজিল করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন"।

আলোচ্য আয়াতে المفسدين শব্দটির অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টিকারী। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের দুবৃত্তরা আল্লাহ্ পাকের আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আযাব হওয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কেননা 'সদূম' নামক শহরের অধিবাসীরা অস্বাভাবিক পন্থায় পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে তা ইতোপুর্বে আর কেউ করেনি। দ্বিতীয়তঃ হযরত লূত (আঃ) যখন তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের কথা বলেছেন তখন তারা বিদ্রুপ করে বলেছে, "আযাব এখনই নিয়ে এস"। তাই তাদের প্রতি আযাব ত্বরান্বিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে।[২]

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى

"যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসলো"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের পাষন্ড লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নিকট বদ-দোয়া করেছিলেন। সে বদ দোয়ার কারণে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়। তারা প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট তাঁর পুত্র সন্তান ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ নিয়ে হাযির হন। এরপর তাদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা মূলতঃ সদূমবাসীকে ধ্বংস করর জন্যে প্রেরিত হয়েছি"।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ

"আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো, কেননা তারা জালেম"।

তারা অন্যায়-অনাচারে সীমা লংঘন করেছে।

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২০, পৃঃ ৫৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৭০-৭১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২২, পৃঃ ১৫৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃঃ ১৭১

"ইব্রাহীম বললো, "ঐ জনপদে তো লূত রয়েছে"।

অর্থাৎ সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা জালেম নয়। অথবা এর অর্থ হলো সদূম এলাকাবাসীর নবী লূত সেখানে রয়েছে। আর নবীর উপস্থিতিতে কিভাবে সেখানে আযাব হবে!

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতস্পুত্র। ভ্রাতস্পুত্রের প্রতি পিতৃব্যের মায়া থাকা স্বাভাবিক, তদুপরি তিনি ছিলেন নবী, তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একথা বলেছিলেন।

قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا

"ফেরেশতারা বললো, "সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালভাবেই জানি"।

لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ

"আমরা লূতকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করবো, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন, লূত এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আমরা রক্ষা করবো। তাঁদের ব্যতীত অন্যদেরকে ধ্বংস করবো। তবে তাঁর স্ত্রী কোপগ্রস্ত হবে। সে রক্ষা পাবে না। কেননা তার সাথে সম্পর্ক ছিল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের। এজন্যে তফসীরকার কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের الغبرين শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, যারা আযাবে গ্রেফতার হবে তাদের সাথে অবস্থানকারী। অর্থাৎ যারা হযরত লূত (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মধ্যে এ গুণের অভাব ছিল এবং দুবৃত্তদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল, তাই তার ধ্বংস ছিল অনিবার্য।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কোন মজলিসে যদি কোন ওলি আল্লাহ অবস্থান করেন তবে তাঁর উপস্থিতি আসমানী জমিনী বালা-মছিবত থেকে রক্ষার পাওয়ার একটি উপকরণ হয়ে যায়। সদূমের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করার আগে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য লোকের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনও উপকারী হয় না যদি ঈমান না থাকে। হরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর ঘটনায় একথাই প্রমাণিত হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। ফেরেশতাদেরকেও রহমত এবং গজব উভয় পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করে থাকেন। যেমন আলোচ্য ঘটনায় ফেরেশতাগণ সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ উভয়টিই বহন করে এনেছেন। যেহেতু আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তাই প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বৃদ্ধকালে পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়, পরে সদূম এলাকাকে ধ্বংস করার খবর

দেয়। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জানেন যে আল্লাহর নবী লূত (আঃ)-এর উপস্থিতিতে সদূম এলাকায় আজাব আসবে না, তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "সদূম এলাকা তোমরা কিভাবে ধ্বংস করবে, অথচ সেখানে লূত রয়েছে"। তাই ফেরেশতাগণ বললেন, "আমরা জানি সেখানে কে রয়েছে। আমরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে রক্ষা করবো"।[১]

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ
رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا
امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾
وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَاِلٰى
مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ
ارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾

তরজমা

(৩৩) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসলো, তাদেরকে দেখে সে অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অক্ষম মনে করলো। তারা বললো, "তুমি ভয় করোনা, চিন্তিতও হয়োনা, আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।

(৩৪) আমরা এ জনপদবাসীর উপর আসমান থেকে আযাব নাজিল করবো, কেননা তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

(৩৫) আর নিশ্চয় আমি এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

(৩৬) আর আমি মাদয়ানবাসীর নিকট তাদেরই ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃঃ ৫৯-৬০

করেছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর, শেষ দিনের (কেয়ামতের দিনের) আশা রাখ, আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা"।

তফসীরুল কোরআন

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ

আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে লূত (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়। লূত (আঃ) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন, কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাযির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে, কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লূত (আঃ)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন,

وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ

"তারা বললো, তুমি ভয় করোনা, চিন্তিতও হয়োনা, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই, কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ

আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আযাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। অতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশংকা করার কোন কারণ নেই যে কাফেররা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে, কেননা তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি দিতে তথা তাদেরকে ধ্বংস করতেই আমরা হাযির হয়েছি।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رجز অর্থ হলো জমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া, জমীনকে উল্টিয়ে দেয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সদুম নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ্ পাক এভাবে এ দূরাত্মা,

নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন, তারা চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হলো, আর তাদের প্রতি প্রস্তরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আযাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

"আর আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে এক প্রকাশ্য নিদর্শন রেখে দিয়েছি"।

বস্তুতঃ যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে সীমা লংঘন করে, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অনাগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে অত্যন্ত বড় শিক্ষনীয় বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো লূত সম্প্রদায়ের সেই বিরাণ জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষনীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اٰية بينة বা সুস্পষ্ট নিদর্শন বলা হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক এ পাথরগুলোকে অনেক দিন রেখে দিয়েছিলেন, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলো দেখেছিলেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমীনের অভ্যন্তর থেকে যে কালো রংয়ের পানি বের হয়েছিল তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, দূরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করে, এটি হলো সুস্পষ্ট নিদর্শন।[১]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

"আর আমি মাদয়ানবাসীর নিকট তাদেরই ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিল, "তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর, তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন কর এবং কেয়ামতের দিনে শুভ পরিণতির আশা কর, আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা"।

হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাতুরা নাম্নী স্ত্রীর ঘরে মাদয়ানের

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৮, পৃ ৩১৩-১৬ এবং খন্ড-১২, পৃঃ ১১৮-৩০

জন্ম। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ্ পাক হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মাদয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো, কেয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, ডাকাতি-রাহাজানি ছিল তাদের পেশা, জুলুম-অত্যাচারে তারা ছিল সিদ্ধ হস্ত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে পৃথিবীতে উৎপাত-উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সকলকে একত্রিত করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে জবাবদেহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আখেরাতের আযাব হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক, অসহনীয়। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় মাদয়ানবাসী তাদের দৌরাত্ম এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো।[১]

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسٰكِنِهِمْ ۖ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۖ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ مُوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا
بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৭) তারা শোয়ায়েবকে মিথ্যা জ্ঞান করলো। এরপর তাদেরকে ভূমিকম্প আক্রমণ করলো। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে ভোর হবার পূর্বেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

(৩৮) এবং আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের বাড়ী-ঘরের বৃত্তান্তই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃঃ ৩৬৮

তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল এবং সৎ পথ অবলম্বনে তাদেরকে বাধা দিয়েছিল, অথচ তারা ছিল বুদ্ধিমান।

(৩৯) আর আমি কারুণ, ফেরাউন এবং হামানকে ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয় তাদের নিকট মূসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। তারা পৃথিবীতে দম্ভ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

(৪০) আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের জন্যেই পাকড়াও করি। তাদের কারো প্রতি আমি প্রস্তর সহ প্রচন্ড ঝটিকা প্রেরণ করি, আর কাউকে ভয়ংকর গর্জন আক্রমণ করে, আর তাদের মধ্যে কাউকে আমি ধ্বসিয়ে দেই ভূগর্ভে, আর তাদের মধ্যে কাউকে আমি করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মাদয়ানবাসীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তাঁর উপদেশ সত্বেও তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ্ পাকের গজব তাদের প্রতি নাজিল হয়। ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিপাত করে। রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ অবস্থা হলো তাদের যারা ধরাকে সরা মনে করতো, যারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করতো, আল্লাহর বিধান অমান্য করতো।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ

শুধু শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতিই নয়, আদ এবং সামুদ জাতিকে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন। এমনিভাবে ফেরাউন, কারুণ এবং হামানকেও তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এদের সকলকে তাদের অপরাধের জন্যে পাকড়াও করা হয়েছে। কি ব্যক্তি, কি জাতি এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ পাকের অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য। আদ জাতি এবং সামুদ জাতির বাড়ী-ঘরগুলো তোমাদের জন্যে জীবন্ত নিদর্শন। হে মক্কাবাসী! তোমরা যখন সিরিয়া সফর কর তখন তোমরা তাদের বিরাণ বাড়ী-ঘরগুলো দেখতে পাও। তাদের কুফর ও নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। শয়তান তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে তথা জান্নাতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ

"তারা জাগতিক দিক থেকে নির্বোধ ছিল না; বরং চতুর ছিল। কিন্তু আখেরাতের

ব্যাপারে ছিল তারা নির্বোধ"।

তফসীরকার কাতাদা এবং কালবী (রঃ) এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা নিজেদের ধারণায় বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু দ্বীনি ব্যাপারে তারা ছিল পথভ্রষ্ট। মানুষকে তারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। তারা যেমন নিজেরা পথভ্রষ্ট ছিল, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতো।

ফররা (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা বুদ্ধিমান ছিল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতো। কিন্তু তা তারা করেনি। তাই নিজেদের অন্যায়-অনাচারের কারণেই তারা চিরতরে ধ্বংস হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যাও করেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের কথাবার্তায় তারা এ ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করেছিল যে যদি তারা অন্যায়-অনাচার থেকে তওবা না করে, সরল সঠিক পথ গ্রহণ না করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু এতদসত্বেও তারা তওবা করেনি। অহংকার ও ঔদ্ধত্য তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। জুলুম অত্যাচার, অন্যায় অনাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে তারা লিপ্ত ছিল। তাই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

"আর আমি কারুণ, ফেরাউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি"।

যেহেতু ফেরাউন এবং হামানের তুলনায় কারুণ উচ্চ বংশের ছিল, সে হযরত মূসা (আঃ)-এর আত্মীয় ছিল, তাই তার নাম ফেরাউন ও হামানের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নবীর আত্মীয় হওয়া নাজাতের ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, যদি সে ঈমান ও নেক আমলের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ

আর মূসা কারুণ, ফেরাউন এবং হামানের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিল, যা হেদায়েত লাভের জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ দূরাত্মা কাফেররা হেদায়েতের পথ গ্রহণ করেনি; বরং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তাদের এ অহংকার এবং ঔদ্ধত্যই হেদায়েতের পথে ছিল বড় বাধা। তাদের সম্পদ ও শক্তির অভাব ছিলনা। কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে সে সব ব্যবস্থা তাদের রক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কার্যকর হয়নি।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ

"তাই আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের জন্যে পাকড়াও করেছি"।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

"তাদের মধ্যে কাউকে পাথুরে ঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়"।

যেমন লূত (আঃ)-এর জাতিকে প্রস্তর বর্ষণ এবং প্রচন্ড ঝড় দ্বারা নিপাত করা হয়।

وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

"তাদের মধ্যে কেউ এমনও ছিল যাদেরকে ভয়ংকর গর্জনে শেষ করে দেয়া হয়"।

যেমন সামুদ জাতি এবং মাদয়ানবাসীকে এভাবে ধ্বংস করা হয়।

وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাকে আমি ভূগর্ভে তার অট্টালিকা সহ ধ্বসিয়ে দেই"।

যেমন কারুণকে এভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়, কেননা সে মুসা (আঃ)-এর শানে বেআদবী করেছিল এবং আল্লাহর আইন অমান্য করেছিল।

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا

"আর তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যাদেরকে আমি নিমজ্জিত করেছি"।

যেমন ফেরাউন এবং তার দলবলের সলিল সমাধি হয়েছিল। অহংকারী ফেরাউন এবং তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহিনীকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। সে শুধু যে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছে, তৌহীদকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ পাকের নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছে তাই নয়; বরং সে নিজেই খোদায়ী দাবী করে বসেছে। তার ক্ষমতার দাপট ছিল প্রচন্ড, তার রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতায় সে অন্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আল্লাহ পাক তাকে সুদীর্ঘ সময় এবং সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ের সদ্ব্যবহার করেনি। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তার হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সে তার দম্ভ অহমিকার কারণে হযরত মূসা (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দেয়নি, সত্যকে গ্রহণ করেনি; বরং সত্যের মোকাবেলা করেছে, তার অবিচারকে জোরদার করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাকে এবং তার সহায়কদেরকে একই সাথে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের একটি ব্যবস্থা করেছেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"আল্লাহ পাক তাদের উপর অবিচার করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করতে থাকে"।

অর্থাৎ এ পর্যন্ত যাদের ধ্বংসের কথা বলা হলো এরা সকলেই ছিল জালেম, অত্যাচারী, সীমা লংঘনকারী, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, তাদের কার্যকলাপ ছিল চরম ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাদের আত্ম-হননের নীতিই তাদের ধ্বংসের জন্যে দায়ী। কেননা আল্লাহ পাক কারো প্রতি জুলুম করেন না এবং কারো প্রতি জুলুম করা তিনি পছন্দ করেন না, বিনা অপরাধে তিনি শাস্তি দেন না। তারা প্রত্যেকে জুলুম-অত্যাচার,

অন্যায়-অনাচার দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলেছিল। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে আযাব। এভাবে অপরাধী পেয়েছে তাদের শাস্তি। আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বদা অন্যায়-অনাচার চলে না, চলতে পারেনা- এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে এসব ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়েছেন এবং পরিণামদর্শী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ
اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا
يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪১) যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়শা, যে নিজের জন্যে ঘর তৈরী করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়শার ঘরই সর্বাপেক্ষা দুর্বল, যদি তারা জানতো।

(৪২) আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(৪৩) মানুষের উপকারার্থেই আমি এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে।

(৪৪) আল্লাহ পাকই আসমান জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে মোমেনদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, জালেমরা নিজেরাই তাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাদের অন্যায় অনাচার তাদের ধ্বংসের জন্যে দায়ী, কেননা তারা কুফর ও শেরকে লিপ্ত

হয়েছিল।

আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের জুলুম অত্যাচারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। যারা শেরক করে, মূর্তি পূজা করে বা মুরতাদ হয় তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটা মাকড়শার ন্যায়, যে নিজের জন্যে একটি ঘর তৈরী করে, যা হয় অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য বাতাসের সঙ্গে তা উড়ে যায় এবং তার ধ্বংস হয় অনিবার্য। মানুষ ধন-সম্পদ এবং প্রাণের নিরাপত্তার উদ্দেশেই ঘর-বাড়ী তৈরী করে থাকে। কিন্তু কোন বাড়ী দ্বারা যদি এ উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে ঐ বাড়ীর কোন গুরুত্বই থাকে না। মাকড়শা তার ঘর তৈরী করে, কিন্তু একটি ফুৎকার সেই ঘরটিকে শেষ করে দেয়। ঠিক এমনিভাবে যারা নিজেদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে নিজেদের আশ্রয়-স্থল মনে করে, বা যে সব মুরতাদরা ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের সহায়ক, সাহায্যকারী এমনকি অভিভাবক মনে করে তাদের অবস্থাও মাকড়শার মত। মাকড়শার ঘর যেমন অত্যন্ত দুর্বল হয়, সামান্য ফুৎকারে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি কী পৌত্তলিক, কী মূর্তি পূজক, কী মুরতাদ-এদের সকলেরই আশ্রয়-স্থল মাকড়শার জালের ন্যায় চরম দুর্বল। মাকড়শার ঘর যেভাবে শীত-গ্রীষ্মে তাকে আশ্রয় দিতে পারেনা, ঠিক তেমনি মূর্তি পূজকদের মূর্তি এবং মুরতাদদের আশ্রয়-দাতারাও তাদেরকে অবশেষে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে আশ্রয় দিতে পারবেনা। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ

"যারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়শা"।

কাফের, মুশরেক ও মুরতাদদের অবস্থাও তাই। তারা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, অন্যদের পূজা করে, অন্যদের সাহায্য গ্রহণ করে এবং অন্যদের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের এ আশা-আকাংক্ষার ঘর মাকড়শার জালের মতই ভেঙ্গে যাবে। মুশরেক, মূর্তি পূজকদের মূর্তি এবং মুরতাদদের সাহায্যকারীরা সেদিন কোন কাজেই আসবে না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেল, মাকড়শার আটটি পা এবং ছয়টি চক্ষু থাকে এবং তার মধ্যে একটি বিষাক্ত বস্তু থাকে। আর মাকড়শার বিষ কখনও মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। ঠিক এমনিভাবে মুশরেক মুরতাদরা সারা পৃথিবীতে শান শওকতে, জাকজমক পূর্ণ পোশাকে ঘোরাফেরা করে। তাদের মধ্যেও একটি বিষাক্ত বস্তু রয়েছে, তা হলো তাদের শেরক ও কুফর, অবশেষে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।[১]

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ

"এবং ঘরের মধ্যে মাকড়শার ঘরই সর্বাপেক্ষা দুর্বল"।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৫, পৃঃ ৬৮

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ঘরের জন্যে সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয় একান্ত জরুরী। ঘরের ছাদ থাকতে হয়, দরজা থাকতে হয়, শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হয়, আর যা কিছু প্রয়োজনীয় তার আয়োজন থাকতে হয়। কিন্তু মাকড়শার ঘরে এর কিছুই থাকে না। তাই তাকে দুর্বলতম ঘর বলা হয়েছে। মাকড়শার ঘর থেকে যেমন কোন উপকার পাওয়া যায়না ঠিক তেমনি মুশরেকরা তাদের পূজনীয় বস্তু থেকে কোন প্রকার উপকার পাবেনা। মাকড়শার ঘর দ্বারা যেমন অগ্নি পানি বাতাস প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়না, ঠিক তেমনি যারা কাফের, মুশরেক, মুরতাদ তারাও কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাবেনা।[১]

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ যদি তারা জানতো যে তাদের ধর্ম বিশ্বাস মাকড়শার ঘর থেকেও দূর্বল, যদি তারা জানতো তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ, তবে তা ভাল হতো।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

'আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যা কিছুকে ডাকে তিনি তা ভালভাবেই জানেন"।

কেউ হয়তো এ প্রশ্নও করতে পারে যে কেউ মূর্তি পূজা করে আর কেউ তা করে না; বরং অগ্নি পূজা করে আর কেউ নক্ষত্রপুঞ্জের পূজা করে, সকলেই কি সমান? তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত কে কিসের পূজা করে আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি অন্তর্যামী।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়"।

অতএব, আল্লাহ পাক ব্যতীত মুশরেকরা যাদের পূজা করে অথবা মুরতাদরা যাদের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের কেউ-ই আল্লাহ পাকের সম্মুখে মাথা তুলতে পারেনা। আর কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই। তাই আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কেউ কখনও কোথাও আত্মরক্ষা করতে পারেনা। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই শাস্তি দিতে পারেন। তবে তিনি কখনও তওবার সুযোগ দেয়ার জন্যে অথবা অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হওয়ার জন্যে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

"আর মানুষের উপকারার্থেই আমি এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি"।

অর্থাৎ মানুষের হেদায়েতের জন্যে তথা মানুষের সত্য উপলব্ধির জন্যে আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। তবে যারা আলেম, জ্ঞানী, যারা বুদ্ধিমান, শুধু তারাই এসব দৃষ্টান্তের তাৎপর্য

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃঃ ৩৭১

যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত জাবের (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, প্রকৃত আলেম সে ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জ্ঞান পেয়েছে, আর সত্য উপলব্ধির পর আল্লাহ পাকের অনুগত হয়েছে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করেছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মাকড়শার দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণে মক্কার কাফেররা বলতে লাগল, আল্লাহ মহান, তিনি এ তুচ্ছ প্রাণীর দৃষ্টান্ত কেন দেবেন? তাদের এ আপত্তিকর বক্তব্যের জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হওয়া একান্ত জরুরী, তোমাদের এ অভিযোগ শুধু তোমাদের নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ বহন করে।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

আল্লাহ পাক আসমান জমিনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির উপকারার্থে, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের প্রকাশার্থে, তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্ত উপলব্ধির জন্যে বুদ্ধির প্রযোজন যে কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়, তিনি সব কিছু বিচার বিবেচনা সহকারেই সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

নিশ্চয় এতে রয়েছে মোমেনদের জন্যে বিশেষ নিদর্শন। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার এবং তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অনেক জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে এ বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে, অবশ্য যারা প্রকৃত মোমেন, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই এ নিদর্শন সমূহ দেখতে পায়।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১৫ই আগষ্ট ১৯৯৪ ইং রোজ সোমবার রাত ১১ ঘটিকায় তফসীরে নূরুল কোরআনের বিশতম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! কবুল কর, এ মহান গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৭১